আত্মজার মুখপত্র

আত্মকথা

জানুয়ারি , ২০২৫

আত্মজার - আত্মকথা

একটু বেশীই দেরী হয়ে গেল এবার আত্মকথার প্রকাশে। এরজন্যে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয় । এর দায় পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে মাথা পেতে নিলাম। শুধু অনুরোধ রইলো সবার কাছেই ... আগামী রজত জয়ন্তী সংখ্যার জন্য লেখা , কবিতা , গল্প , ছবি পাঠাতে থাকুন এখন থেকেই। যাতে বেশ কিছুটা সময় থাকতেই আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখা , ছবি হাতে পেয়ে যেতে পারি। বেশ কিছু লেখার জন্যে এবারে অপেক্ষা করেছিলাম । শেষপর্যন্ত সেই সব লেখা এসে পৌঁছায়নি আমাদের কাছে। আশা করছি আগামী সংখ্যায় আমরা সেই সব লেখা প্রকাশ করতে পারব ।

শীত , গ্রীষ্ম এবং অবশেষে বর্ষার কালো মেঘ সরিয়ে শরতের উন্মুক্ত নীল আকাশে আমাদের ঘরের মেয়ে উমার ঘরে ফেরার হাসির ঝলক হৃদয়ে নিয়ে শেষপর্যন্ত শীতের সকালে পঁচিশ বছরে পা রেখে তবেই এই আত্মকথা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারলাম ... এইটুকুই আমাদের আনন্দ। ভালো থাকবেন , ভালোবাসবেন , পাশে থাকবেন বন্ধুরা!

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে স্বপন নস্কর

দেখতে দেখতে চব্বিশ বছরে পা দিলাম আমরা। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল যেঁ সদ্যজাত আত্মজার আজ সে এখন পঁচিশ বছরের প্রাণচঞ্চল তরুণী। আজ আমরা সাহস করে বলতে পারছি এক দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরুতে রয়েছি আমরা যার হয়ত কোন শেষ নেই। আর এই যাত্রাপথে তার ছায়াসঙ্গী হয়ে রয়েছে **আত্মকথা।** শেষ প্রকাশ হয়েছিল জানুয়ারি মাসে পিকনিকের পরে। একটু দেরী হয়ে গেল এবার। সামনেই ১২ জানুয়ারি আমাদের এবারের পিকনিক। আত্মজার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা অনেক সঙ্গীকেই রেখে এসেছি পিছনে। কিছুদিন আগেই চলে গেলেন আমাদের এক পুরনো বন্ধু ডঃ অমিতাভ রায়। এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের ভীষণ মনে পড়ছে আজ এই পঁচিশ বছরে পা দেবার মুহূর্তে। সবাইকে অনুরোধ করব এই পঁচিশ বছরের বিশেষ রজত জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুতি নিন এখন থেকেই। পত্রিকা সম্পাদকের কাছে লেখা , কবতা , ছবি পাঠাতে শুরু করুন এখনই। সবাইকে জানাই শীতের শুভেচ্ছা । ভালো থাকবেন বন্ধুরা ... যেখানেই থাকুন, জুড়ে থাকবেন , জড়িয়ে থাকবেন আত্মজার সঙ্গে।

সঞ্জয় শিকদার , সাধারণ সম্পাদক , আত্মজা

অমিতাভ

শুনেছি একটি শিশু যখন জন্মায়, মানবসভ্যতার পথচলার সম্পূর্ণ ইতিহাসকে বুকে নিয়ে সে এই পৃথিবীতে আসে। সে আসে তার জৈবিক উত্তরাধিকার নিয়ে আর সে শরীরে বড়ো হয় এই জৈবিক উত্তরাধিকারের প্রভাবে। কিন্তু সে বিকশিত হয় তার সেই মানবসভ্যতার উত্তরাধিকার বুকে নিয়ে। অথচ কত অর্বাচীন এই আমরা আর আমাদের মনন। আমরা মনে করি আমাদের জীবনের এই নিজস্ব সীমানাটুকুই বুঝি পৃথিবীর শেষ কথা। এই বিরাট বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মানব তার অবুঝ মন নিয়ে ভেবে বসে যে তার জীবনের শুরু আর শেষটাই বুঝি সম্পূর্ণ পৃথিবী। তাই অমিতাভ যেদিন চলে গেল বেশ একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা আমায় গ্রাস করে ফেলেছিল।

অমিতাভকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৯৮ সালে নির্মলা শিশুভবনে শর্মিলা আর ও একসঙ্গে এসেছিল। একটা ছোট্ট মিটিং হয়েছিল আরো কয়েকজন দম্পতির সঙ্গে। যতদূর মনে পড়ে অনুপ আর অঞ্জনা এসেছিল , নীলাঞ্জনা , গৌতম গুপ্ত , দেবাশীষ রায় , গীতা এবং সেই সঙ্গে গৌতম ঘোষ আর তনুশ্রী। উদ্যোগ নিয়েছিলেন মূলত সিস্টার অড্রে। আজকের আত্মজা'র বীজ যদি রোপন করা হয়ে থাকে তাহলে সেই দিনটিকেই ধরতে হবে। কারণ সেই প্রথম আমরা একটা সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি করার পরিকল্পনা করি সিস্টার অড্রে'র ভাবনা অনুযায়ী। এর পরে ২০০০ সালে ৫ নভেম্বরে আমরা যখন মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন সই করলাম আমাদের সেই প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অমিতাভ ছিল একজন কমিটি মেম্বার। অর্থাৎ অমিতাভ আমাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যাকে আমরা হারালাম আমাদের চলার পথে।

অমিতাভ একটু চুপচাপ থাকতে ভালোবাসলেও খুব গম্ভীর অথবা রাগী ছিলনা। একবার আমাকে কয়েকটা টেস্ট করতে বলল কী ভেবে জানিনা। টেস্ট গুলো করিয়ে ওকে যখন দেখালাম তখন হাসতে হাসতে বলল ভেবেছিলাম মেডিক্যালি অ্যারেস্ট করে ফেলব তোমাকে কিন্তু তোমাকে ধরা গেলনা। চিকিৎসক হিসাবে বেশ জনপ্রিয় ছিল অমিতাভ। তার একটা কারণ হল অকারণে ওষুধ দিতে চাইতনা। বলত অ্যান্টিবায়োটিক মানে হল দুদিকে ধার ওয়ালা তলোয়ার একদিকে যেমন অসুখ সারায় তেমন আর একদিকে অসুখ তৈরি করে। একবার আমার স্ত্রী একটা টেস্ট করানোর পরে ডাক্তাররা অনেক কিছু করতে বলে। অমিতাভর কাছে যেতে ও কিন্তু সোজা বলে দিল টেস্ট করলে অনেকেরই এটা পাওয়া

শেষদিকে অমিতাভকে দেখতাম আরো চুপচাপ হয়ে যেতে। সিগারেটের পরিমান বেশি হয়ে গেল। নিজেকে যেন একটু সরিয়ে নিত সবার কাছ থেকে। কিন্তু দেখা হলে সেই অবিকল হাসিমুখ। চিকিৎসক হিসাবে অত্যন্ত সৎ এবং অসম্ভব উপকারী স্বভাবের ছিল। নিজে থেকে খুব বেশি কথা বলত না। কিন্তু কথা বললে খুবই আন্তরিক ভাবে কথা বলত আর কোন বিষয় উঠলে সেটা যতটা সম্ভব বিশদে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করত। চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরেও অন্যান্য অনেকে বিষয় নিয়ে ওর জ্ঞান ছিল যেটা কথা বললেই বোঝা যেত ।

পৃথিবীতে মানুষ আসে চলে যাবার জন্যেই । আসাটা যেমন অনিশ্চিত ঠিক তেমনই নিশ্চিত এই চলে যাওয়া। তাই মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়াই হয়ত সঠিক। কিন্তু এমন একজন মানুষের অকস্মাৎ এই চলে যাওয়ার জন্য আমাদের মন একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা। তাই এই বিয়োগ বেদনা থেকেই যাবে দীর্ঘ দিন ধরে।

নিয়মিত বিভাগ – পাখীদের কথা - পর্ব ৮

ঝুঁটি – ভারুই

(The Crested Lark)

প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

ঝুঁটি- ভারুইকে চড়ুইপাখি বলে ভুল করার সেরকম কোন কারণ নেই। এরা আকারে চড়ুইয়ের থেকে খানিকটা বড়ো। এদের মাথার ঝুঁটিটা আমাদের চিনিয়ে দেয় ওটা ভারুই পরিবারের পাখি । পুরোটাই ভারুই পাখি মতো দেখতে, আর তাদের মাথায় বেশ বড়ো ঝুঁটি, তাই আমাদের রাজ্যের মানুষজন এদের ভারুই নামে চেনে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোয় এই ঝুঁটি- ভারুইদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার এদের চন্ডুল নামে ডাকে।

এদের ঝুঁটি আর মাথা, ঘাড়, পিঠ ও লেজের পালকে একটু লম্বাটে ধরনের খয়েরী ডোরা দেখা যায়। আবার বুকের পালকে খয়েরী ছিট ছিট। পেটের দিকের পালকের রঙ ফ্যাকাসে ছাই। এদের ঠোঁটের গড়ন সূচালো আর লেজ লম্বাটে – চোখের তারা হালকা বাদামী, পায়ের রঙ ঠোঁটের রঙ খানিকটা কালচে বাদামী। সবকিছু মিলিয়ে এরা আদতে ভারুই পরিবারের পাখি।

ঝুঁটি- ভারুই পাখি বেশীরভাগ সময়ে মাটির কাছাকাছি থাকে। ছোট ঝোপঝাড়, শুকনো মাটি, অল্প স্বল্প ঘাস আছে এমন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে এরা বেশ পছন্দ করে। এই পাখিদের একটা অভিনব স্বভাব হলো এরা দুটো বা চারটের একটা দল সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে পোকা, ঘাসের দানা খুঁটে খুঁটে খায়। তাদের মাথার ঝুঁটি সদা খাড়া রাখে। তবে ভয় পেলে মাটিতে চুপ করে পড়ে থাকে। আর বিপদ – আপদের আশঙ্কায় বা বিপদের সম্মুখীন হলে তারা ডানা মেলে দেয়। মাটির খানিকটা ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে উড়ে যায়। এ–দৃশ্য দেখলে মনে হবে যে এরা বেশি ওড়াউড়ি করতে সেরকম পটু নয়। ওড়ার সময় তি–উর তি- উর ক'রে মিস্টি সুরে ডাকে – আকাশে উড়ে বেড়ায়।তবে বেশি উঁচুতে উড়তে পারে না এই ঝুঁটি – ভারুই।

এরা বাসা তৈরি করে বসন্তকালে, খড়কুটো, ঘাস আর নানান জিনিস এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে আনে। তাদের বানানো বাসা ছোট্ট, অল্প গর্তে ঝোপের কাছে একটা বাটির মতো। এই পাখিরা গোটা চারেক ডিম পাড়ে সেই বাসায়। ডিমের রঙ মাটির রঙের সাথে মিশে যায়, লালচে খয়েরী ছিট থাকে বলেই।ঝুঁটি – ভারুই পাখিদের পছন্দের খাবারের তালিকায় থাকে পোকা, দানা বা ধান জাতীয় শস্য কণা। পক্ষিপ্রেমীদের কাছ ঝুঁটি- ভারুই খুবই আদরণীয়।

(উপরের ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

নিয়মিত বিভাগ – গনিতাশ্রু – পর্ব ৩

অনুপ দেওয়ানজী

টুটুল আর তিতলি আজ দু’জনে মিলে একটা তন্দুরী হাফ-চিকেন অর্ডার করেছে। টুটুল কিছুদিন আগে স্কুলে ভগ্নাংশ আর দশমিকের সম্বন্ধে পড়ে এসেছে। সে গম্ভীরভাবে বললো, জানিস্ আমরা শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫) চিকেন অর্ডার করেছি। তিতলি এরকম একটা বিদ্ঘুটে শব্দ শুনে নির্বিকারভাবে বললো, আমরা অর্ধেক চিকেন অর্ডার করেছি; অতসব দশমিক-টশমিক জানি না, জানতেও চাই না। টুটুল কিছুটা নিরস্ত হয়ে পড়লেও, মা এই সুযোগটা ছাড়লেন না। টুটুল, তুমি অর্ধেককে শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫) করে যেমন বলতে শিখেছ, বল তো তুমি যে কিছুদিন আগে ৩ ১/২ বা ৭/২ পরিমাণ পিৎজার টুকরো খেলে, সেটা দশমিকে কত! টুটুল এটা শিখেছে; সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তিন দশমিক পাঁচ (৩.৫) – তিনটে গোটা টুকরো আর অর্ধেক। তাহলে এই দশমিক পাঁচ কথাটার মানে কি? দশমিক পাঁচ কিভাবে অর্ধেকের সমান হল? দশমিকের বাঁদিকে যে সংখ্যা থাকে, তা হল পূর্ণসংখ্যা, ইংরাজীতে যাকে বলে integer; আর দশমিকের পর ডানদিকে যা (বা, যা যা) থাকে, তা দিয়ে ঠিক হয় ভগ্নাংশের পরিমাণ কতটা। যেমন, দশমিক পাঁচ মানে দশ ভাগের পাঁচ ভাগ, অর্থাৎ অর্ধেক। সেরকম দশমিক এক মানে দশ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

তিতলি একটু বিরক্ত হলেও মন দিয়ে শুনছিল। বলে উঠল, তাহলে শূন্য দশমিক পাঁচ মানে কি? টুটুলের জবাব, দশমিকের আগে শূন্য মানে পূর্ণসংখ্যা শূন্য, মানে একটাও গোটা নেই। আর দশমিকের পর পাঁচ মানে দশ ভাগের পাঁচ ভাগ আছে, তার মানে অর্ধেক আছে। তাহলে আমরা অর্ধেকের অর্ধেক, মানে চার ভাগের এক ভাগ কিভাবে বলব? দশ ভাগ করে তো ওটা হবে না। তিতলির এই প্রশ্নে টুটুল ঘাবড়ে গেল। এতটা তো এখনও শেখা হয় নি। বিপদতারিণী মা এলেন। তখন আর দশ ভাগ করে হবে না; তখন একশ ভাগ করতে হবে আর তার পঁচিশ ভাগ নিতে হবে, মানে একশ ভাগের পঁচিশ ভাগ। তার জন্য অবশ্য দশমিকের পর দু’টো সংখ্যা লাগবে; লিখতে হবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ (০.২৫)। এটাকে দশ ভাগের দুই ভাগ ও একশ ভাগের পাঁচ ভাগ বলেও ভাবতে পারা যায়। দশমিকের পর প্রয়োজনমত যতগুলো খুশী সংখ্যা বসানো যায়। দশমিকের পর একটা সংখ্যা থাকলে দশ ভাগ, দু’টো থাকলে একশ ভাগ, তিনটে থাকলে হাজার ভাগ, ইত্যাদি। সেইজন্য এটাকে দশমিক ব্যবস্থা, বা ইংরাজীতে decimal system বলা হয়। যদি দশমিকের পর একটা সংখ্যা থাকে, তাহলে দশ ভাগ করে এক ভাগ, দুই ভাগ, তিন ভাগ, ইত্যাদি করে দশ ভাগ অবধি ভাবা যেতে পারে, তাতে মাত্র দশ রকম ভগ্নাংশ লেখা যেতে পারে।

এই সময় টুটুল তার পরিচিত জগতে এসেছে। সে বলল, যদি দশ ভাগের দশ ভাগ নাও, তাহলে তো পুরোটাই নেওয়া হল। তাই তখন শূন্য দশমিক দশ (০.১০) না লিখে, এক দশমিক শূন্য (১.০) লিখতে হবে, যার মানে হল একটা গোটা। তিতলির প্রশ্ন, কেন শূন্য দশমিক দশ (০.১০) লিখলে ক্ষতি কি? টুটুল চুপ। মায়ের ব্যাখ্যা, ক্ষতি এটাই যে শূন্য দশমিক দশ (০.১০) মানে হল দশ ভাগ্রে এক ভাগ ও একশ ভাগের শূন্য ভাগ, অর্থাৎ দশ ভাগ্রে এক ভাগ। দশমিকের পর দু’টো সংখ্যা থাকলে দশ ভাগের একটা (এক থেকে নয়) ভাগ ও একশ ভাগের একটা (এক থেকে নয়) ভাগ ভাবা যায়। ব্যাপারটা একইরকম যদি একশ ভাগের একটা (এক থেকে নিরানব্বই) ভাগ ভাবো। তার মানে আমরা একশ রকম ভগ্নাংশ লিখতে পারি দশমিকের পর দু’টো (শূন্য থেকে নয়) সংখ্যা দিয়ে। দু’টোই শূন্য মানে একশ ভাগের শূন্য ভাগ, মানে শূন্য বা কিছুই না; আর একশ ভাগের একশ ভাগ মানে পুরোটা বা গোটাটা, যেটাকে এক দশমিক শূন্য (১.০) লিখতে হবে। এরকমভাবে দশমিকের পর তিনটে সংখ্যা থাকলে হাজাররকম ভগ্নাংশ লিখতে পারি, চারটে সংখ্যা থাকলে দশ হাজার রকম ভগ্নাংশ লিখতে পারি। দশমিকের পর সংখ্যা যত বাড়াবে, সম্ভাব্য ভগ্নাংশের সংখ্যা তত বেড়ে যাবে। আমরা যেমন সীমাহীন ভাবে দশমিকের পর সংখ্যা বাড়াতে পারি, তেমনই সীমাহীন সংখ্যার ভগ্নাংশদের আমরা এভাবে দশমিক ব্যবস্থায় লিখতে পারি। গণিতের এক উপপাদ্য বলে, যে কোনো ভগ্নাংশকে আমরা দশমিক ব্যবস্থায় লিখতে পারি। সত্যি বলতে, পূর্ণসংখ্যা সহ যে কোনো ভগ্নাংশকে দশমিক ব্যবস্থায় একটা উপায়েই (uniquely) লেখা যায়।

এবার টুটুলের প্রশ্ন, তাহলে ১.০ আর ১.০০ আর ১.০০০ মধ্যে তফাৎ কি? কোনো তফাৎ নেই। দশমিকের পর শেষ যে সংখ্যাটায় এক থেকে নয়ের মধ্যে কোনো একটা আছে, তার পরে সব জায়গায় শূন্য থাকা যা, আর কিছু না থাকা একই

ব্যাপার। কারণ, তার পরের ভাগগুলোর সব কটা থেকে আমরা শূন্য ভাগ নিচ্ছি। তাই, ১.৫ আর ১.৫০ আর ১.৫০০ সব একই জিনিষ; এক এবং অর্ধেক, বা ইংরাজীতে one and half. একইভাবে ৩.০২ আর ৩.০২০ আর ৩.০২০০ সব একই জিনিষ; তিনটে গোটা আর একশ ভাগের দুই ভাগ।

তিতলি হাই তুলতে তুলতে বলল, আমরা এত ঝামেলায় কেন যাচ্ছি। গতবার অত ভগ্নাংশ শিখলাম, সেগুলোর কি হবে? মা বললেন, দু'টো একই জিনিষ। তবে কখনও কখনও একটু বড় সংখ্যা দিয়ে ভগ্নাংশ হলে, তার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করতে অসুবিধা হয়, যোগ-বিয়োগ করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু দশমিক ব্যবস্থায় সেটা অনেক সহজ হয়। যেমন, ৫৩৮৪৭৬/২৩৯৮৬৫৪৭ মানে ঠিক কতটা ভগ্নাংশ, তা ধারণা করা একটু কঠিন। কিন্তু দশমিক ব্যবস্থায় এর সমতুল্য পরিমাণ হল ০.০২২৪৪৯০৮, মানে একশ ভাগের দুই ভাগ এবং আরেকটু বেশী। আমরা যদি ৫৩৮৪৭৬/২৩৯৮৬৫৪৭-র সাথে ৮৬৫৪৮/৪৬৭৫৩২ যোগ করতে চাই, ভগ্নাংশ দিয়ে খুব কঠিন হবে। কিন্তু দশমিক ব্যবস্থায় এই যোগফল হল ০.০২২৪৪৯০৮+০.১৮৫১১৬৭। এই দু'টো ভগ্নাংশ একটার উপর আরেকটা রেখে যোগ করলে (দ্বিতীয়টার শেষে একটা শূন্য বসাতে হবে যাতে দশমিকের পর সমান সংখ্যক সংখ্যা থাকে) আমরা পাই ০.২০৭৫৬৫৭৮। এটা সহজে বোঝা যাচ্ছে যে যোগফলটা একশ ভাগের কুড়ি ভাগ এবং আরেকটু বেশী, প্রায় একুশ ভাগের কাছাকাছি, বা হাজার ভাগের দু'শো সাত ভাগ ও একটু বেশী। দশমিক ব্যবস্থার এই সুবিধাটা কিন্তু মানতেই হবে। আরেকটা ছোটখাটো সুবিধা হল দশমিক ব্যবস্থায় যে কোনো ভগ্নাংশকে একটা উপায়েই লেখা যায়। অর্ধেক বোঝাতে তুমি ১/২, বা ৪/৮, বা ৫/১০, বা ৫০/১০০ লিখতে পারো, কিন্তু দশমিক ব্যবস্থায় তা হল ০.৫। এবার টুটুলও হাই তুলছে দেখে মা বললেন, আরেকটা বেশ বড় সুবিধা অল্প কথায় বলি। দশমিক ব্যবস্থায় দশ বা একশ বা হাজার, ইত্যাদি দিয়ে গুণ আর ভাগ করা খুব সোজা। শুধু দশমিক চিহ্নটাকে এক বা দুই বা তিন ঘর ডানদিকে বা বাঁদিকে সরাতে হবে; গুণ করলে ডানদিকে আর ভাগ করলে বাঁদিকে; দশ দিয়ে করলে এক ঘর, একশ দিয়ে করলে দুই ঘর, হাজার দিয়ে করলে তিন ঘর, ইত্যাদি।

টুটুল এবং তিতলি একসঙ্গে বলল, এবার ঘরে চল। আর কোনওদিন অর্ধেক চিকেন খেতে আসব না; খেলে গোটা খাব।

Dear Math,

Please grow up and solve your

Own Problems.

I’m tired of solving them

For You !!!!

হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রং – ছোটদের পাতা

তৌশিনি দাস

পূজা দত্ত

Moment of Pride

Subarna Das, aged 15 years, is a student of Class VII, Narayana School, Park Circus.

On Dec 12, 2024, the school housed an art and craft & writing competition sponsored by Axis Bank. Subarna 's name was proposed for the art and craft competition by her close friend Fahima on the day of the competition. Subarna was furious but managed to draw a human figure. She was declared third in the competition.

Subarna received a bronze medal, a certificate and Rs 150/- as prize money. This was her first medal in art and craft. She was so happy….

In the picture Subarna is the third student from right. She is daughter to Aditi Roy and Debasis Das.

We heartily welcome……….

Our new members in Atmaja Family

অদিতি রায় , দেবাশীষ দাস , সুবর্ণা

সৌমি নাগ ,শুভদীপ দত্ত , তপস্যা

Atmaja Family

Suchismita Sikdar

Atmaja always have a special place in my heart. The story of Atmaja starts from the day our parents decided and planned to make a community of adoptive parents. From the days of my childhood, I came across the name Atmaja. At that time I didn't have much idea about that. Then Ma and Baba started with the story of Atmaja as well as my homecoming. My first schooling starts at age three at a nursery school and I got stranded with my beloved childhood friend 'Bondhu'. As far as my memory strikes, Atmaja used to conduct some art and craft activities for us at Kalindi. We used to meet with my friends and enjoy and learn. As we all are toddler at that time, meeting with Atmaja friends used to make us very happy and we would share our chit chats. Annual picnic is another part of meeting Atmaja friends, playing different games arranged by Anup-Kaku and drawing competitions and the most happening part is the gift at the end of the picnic. Such memories are always cherishing to remember and laugh at.

Meanwhile we have been detached from Atmaja for four years as Baba was transferred to Lucknow. After coming back from Lucknow , Salboni trip in 2008 was the memorable one. Playing Holi along with Atamaja friends was the utmost fun and also seeing the place for money printing. Having silly childhood chit-chats was the best part. We also had Rabindra-Nazrul Sandhya with which we started our cultural learning and practicing. Then comes the 10th year celebration of Atmaja at Jadavpur University in 2010. Still remember the practicing days for the 10th year celebration at Swapan Uncles place with different musical instruments and different sequential programs. Also I remember some acts performed by Piya Kakima and Anup Kaku. The 10th year celebration is a memorable one with different types of cultural events and also important talks about Atmaja. The year 2010 was memorable for another reason as I completed the milestone of class 10, stepping into the journey to higher learning.

For a couple of years, we Atmaja friends were on and off as we were busy focusing on our studies. However, meeting Atmaja friends is a routine on annual picnics where we started discussing the new changes in life. In 2021, I decided to move out from Kolkata to Bangalore for my career development. Meeting with Atmaja family doesn't happen that often, but with social media technology we have always been in touch and having chitchats. Because of that, with a heavy heart, I missed the 20th anniversary celebration of Atmaja, but hope to celebrate the 25th anniversary together. Finally, Atmaja is and will be always another family for us. I wish to participate in as many Atmaja events as I can just for the fun of it.

Embracing Parenthood - Our Transformative Journey Through Adoption

Madhushree Sarkar

Princeton, New Jersey

Adopting a child has been the most profound decision of our lives, reshaping not only the life of our daughter but also our own. It transformed our perspective on life. As a couple who had faced multiple miscarriages and several setbacks with assisted reproductive technology (ART), the adoption process was a challenging and emotional journey. Our decision to adopt arose from a deep desire to nurture, raise, and provide a loving home for a child who needed it, one whom we could call "our own." Yet, this path was fraught with uncertainties and questions.

Facing Realities during the Adoption Process

The adoption process brought with it a myriad of bureaucratic complexities and an emotional rollercoaster. We were met with endless paperwork, interviews, and waiting periods, all of which tested our patience and heightened our anxiety. We grappled with questions about our readiness for parenthood and our ability to meet our child's emotional needs. Despite the emotional preparation required, one certainty remained: our commitment to offering unconditional love and stability. We envisioned a future filled with joy, growth, and learning, hopeful for a loving bond that transcended our child's past experiences.

Transformation and Growth after Adoption

Meeting our adopted daughter for the first time 18 years back marked a profound shift in our lives. At just a month old, she was a tiny bundle of potential and promise. Holding her in my arms, I was overwhelmed with a unique blend of joy, gratitude, and a deep sense of responsibility. The realization dawned on us that our lives would irrevocably change; we were no longer carefree adults but dedicated parents committed to nurturing her growth and development.

Our immediate focus became creating a loving environment where she could thrive. This involved not only meeting her physical needs but also providing emotional and psychological support. We invested time in establishing routines that would offer her a sense of security and stability. Each milestone—her first smile, her first steps—became moments of celebration and reflection. We marveled at how quickly she adapted to her new home, her resilience shining through even in the earliest stages of her life.

As the weeks and months unfolded, we faced a series of challenges and triumphs. Adjusting to life with a new family member required significant changes in our daily routines, work schedules, and even our social lives. We found ourselves juggling responsibilities with newfound dedication, learning to balance our roles as caregivers with our need for self-care and relationship maintenance. This period was a test of our adaptability and commitment, but it also highlighted our capacity for growth and resilience.

Our daughter's ability to trust, love, and be loved despite her early experiences was nothing short of inspiring. We witnessed firsthand how love and care could help heal past wounds and foster emotional development. Her

journey of growth was intertwined with our own, as we continuously adapted our parenting strategies to meet her evolving needs.

Adopting a daughter also prompted us to reflect deeply on gender dynamics and the unique challenges of raising a girl. We were mindful of the societal influences and expectations that could impact her self-esteem and self-image. Our aim was to create a supportive environment where she could explore her identity and potential without limitations. We made a conscious effort to celebrate her strengths, encourage her interests, and provide positive role models.

We understood the importance of empowering her to realize her capabilities and pursue her passions. From early childhood, we encouraged her to express herself, make choices, and develop her interests. This included introducing her to diverse role models—both female and male—who exemplified qualities we valued, such as resilience, kindness, and creativity.

Navigating questions about her identity and background was another significant aspect of our journey. We approached this with sensitivity and openness, recognizing the importance of helping her understand her origins and the context of her adoption. We encouraged open dialogue, providing her with age-appropriate explanations and supporting her exploration of her roots.

We also emphasized that her identity was something she could shape for herself. Rather than imposing a fixed narrative, we supported her in exploring her own sense of self. This involved discussions about family history, cultural heritage, and the concept of identity as a personal journey. We aimed to empower her to take pride in her background while also embracing her individuality.

Our journey of transformation and growth after adoption was marked by continual learning and adaptation. Each day brought new insights into ourselves and our roles as parents. We learned to appreciate the profound impact of unconditional love and the importance of creating a nurturing environment where our daughter could flourish. This process not only transformed her life but also enriched ours, deepening our understanding of family, resilience, and the power of love.

Self-Reflection and Growth

Throughout this transformative journey, self-reflection became an essential part of our experience. We delved deeply into our upbringing, values, and biases, uncovering aspects of ourselves we had previously overlooked. This process of introspection highlighted the importance of adaptability and openness in our parenting approach. We recognized that our preconceived notions about parenthood and family dynamics needed to evolve to meet the unique needs of our adopted daughter.

One significant area of self-reflection was understanding and addressing our emotional resilience. The adoption journey tested our patience and emotional endurance, revealing areas where we needed to strengthen our coping mechanisms. We learned to navigate our anxieties and uncertainties more effectively, striving to maintain a positive outlook for the sake of our daughter’s well-being.

We also confronted and worked through our vulnerabilities as parents. The challenges of adoption, from bureaucratic hurdles to emotional adjustments, forced us to confront our limitations and fears. This journey required us to embrace vulnerability and seek support when needed, whether through counseling, parenting classes, or discussions with fellow adoptive parents. By acknowledging our imperfections and actively seeking growth, we became more equipped to provide the care and stability our daughter deserved.

Our commitment to continuous improvement as caregivers led us to explore new parenting strategies and approaches. We educated ourselves about trauma-informed parenting and learned about the potential impacts of early life experiences on our daughter’s development. This education helped us approach her needs with greater empathy and understanding, ensuring that our parenting practices were both supportive and nurturing.

Furthermore, our adoption journey inspired us to become advocates for adoption awareness and support. We realized that sharing our story could help dispel myths and misconceptions about the adoption process. By openly discussing our experiences, we aimed to foster a broader understanding of adoption and encourage others to consider it as a viable path to parenthood.

This advocacy work also contributed to our personal growth. Engaging with the adoption community and participating in awareness initiatives expanded our perspective and deepened our appreciation for the diverse experiences of adoptive families. It reinforced our belief in the power of community support and the importance of creating inclusive and supportive environments for all families.

In addition to these reflections, we consistently evaluated our own values and beliefs about family, identity, and love. This ongoing self-examination helped us build a more inclusive and empathetic worldview, which we strived to impart to our daughter. We recognized that our journey was not just about raising her but also about growing and evolving as individuals and as a family unit.

Ultimately, this journey of self-reflection and growth enriched our lives and our parenting. It allowed us to approach our roles with greater awareness, empathy, and commitment. Our experiences have not only shaped us into better parents but also deepened our understanding of the profound impact that love, support, and openness can have on a child’s life.

Conclusion

Adopting our daughter has profoundly impacted our lives in countless ways, shaping us into better individuals and parents. The journey was filled with moments that challenged our perceptions and expanded our capacity for love. It was not merely about fulfilling a desire for parenthood but about embracing a path that required deep personal commitment and transformation.

Initially, the uncertainties surrounding adoption tested our resolve. We grappled with the complexities of the process, faced emotional highs and lows, and confronted our own fears and limitations. These challenges forced us to question our assumptions about family and parenthood, pushing us to develop a deeper understanding of ourselves and each other.

Through this journey, our capacity for love grew exponentially. The bond we formed with our daughter transcended biological connections, built on shared experiences, mutual trust, and unconditional support. This love not only nurtured her development but also brought out qualities in us that we had not fully recognized before—patience, empathy, and an unwavering commitment to her well-being.

Our personal growth was a central theme of our experience. We learned to adapt our parenting approach, continually reflecting on our values, biases, and expectations. This self-reflection was essential in helping us provide a nurturing environment that supported our daughter’s emotional and psychological needs. We discovered strengths we didn’t know we had and developed a resilience that helped us navigate the ups and downs of parenting.

The transformation wasn’t limited to our roles as parents. It extended to how we viewed the world and our place within it. Our perspective on family, identity, and community broadened, enriching our understanding of the diverse experiences that shape a child's life. We became more attuned to the complexities of adoption and the importance of creating an inclusive, supportive environment for all families.

Our journey was also marked by a profound commitment to nurturing our daughter’s potential. We dedicated ourselves to understanding her unique needs, fostering her interests, and empowering herto become the person she aspires to be. This commitment was not limited to only addressing her immediate needsbut also preparing her for the broader challenges of life. We aimed to provide her with the tools and confidence to navigate her identity and make her place in the world.

Ultimately, our decision to adopt was a profound act of compassion and love. It was about providing a child in need with a family and a future, but it also transformed us in ways we could never have anticipated. The journey was a testament to the power of love to create change and the ability of the human spirit to grow and adapt. Adopting our daughter enriched our lives beyond measure, teaching us the true meaning of family and the boundless nature of love.

Today when we look at her, we are amazed at how much she is like us – the way she walks, talks, and interacts with others, her values and principles, and most importantly her likes and dislikes. She is indeed a true reflection of us. We see ourselves in her.

I, Madhushree Sarkar, and my husband, Debashis Sarkar, along with our daughter Tiyasha, live in Princeton, New Jersey, USA, for the last 16 years. My husband is a good friend of Anup Dewanji, who is presently the Chairman of Atmaja. During his recent visit to New Jersey, Anup-da talked about Atmaja and asked me to write an article for Atmakatha. I readily agreed. I am so happy to learn about Atmaja and that it is approaching 25 years of existence. We would love to be a part of this wonderful organization.

Adoption leaves? Haven't heard of it

Somdatta Chakraborty

35-year-old Renu worked as an Engineering Manager in a large corporate house. She was not married yet, but could not wait any longer to start her family. She was sure of becoming a mother, hence applied for adoption as a single mother on CARA a few years ago. Following which she had to go through a rigorous background check, medical check-up, psychometric analysis and a long list of other mandatory paperwork. Ever since her background checks and other paperwork were completed with CARA, she had been put on a virtual queue. The referral of child takes about three to four years to come through. Renu had been waiting too on the waitlist since quite long, but the good news was that her referral was expected by the end of next year.

It was a busy Monday and Renu was working attentively on a presentation deck, when the familiar sound of a new email entering the inbox diverted her attention a bit. She opened outlook with her habitual gait to find that she had received a much-anticipated email from the HR department. “This must be related to the adoption leave policy” she thought to herself as she attentively read every line of the precious email. The slight smile of hope that she had on her lips when she had opened the email faded slowly as she kept reading through it. After reading each line carefully multiple times, she sat there staring blankly at the computer, worried and disappointed.

Few days ago, Renu had written an email to her HR department, seeking details about leave policies for adoptive parents. She had stated that she was a prospective adoptive mother and was waiting to welcome her child. She wanted to ensure that her company would provide her ample child care leaves so that she gets the time to nurture her little one. Renu, being a prospective single mother, had a lot on her shoulders from child care to paperwork, so she wanted to secure a good support from her workplace, hence informed them about her decision well in advance.

Her organization boasts for being an equal opportunity and inclusive organization, so she had sent an enquiry email about the leave policies for adoptive parents to the HR department with high expectation of receiving a positive reply. Her company did assure her of leaves that she will be entitled to but with a clause which she wasn't sure would be possible. The reply that she received was, “As part of the company policy as guided by the labor law in India, the adoptive parent is entitled to three months of paid leave if they adopt a child who is below three months in age”.

Unfortunately, there was no way Renu or any other adoptive parent could ensure they are matched with a child below three months in age. CARA or Central adoption resource authority that governs adoption across India allows applicants to choose an age range for their future adoptive child, such as 0-2 years, 2-4 years and so on. Renu had applied in the 0-2 years category, which means she can receive referral of a child whose age is anywhere between a month to two years and it doesn't guarantee that she would get a child who is less than three months of age. She felt hopeless at the moment. How could she manage all alone with an infant along with the professional commitments if she is not allowed ample leave. Renu was aghast.

Renu’s story is a hard reality for many adoptive parents in India. The leaves provided to mothers at birth are for mother’s recuperation and child care. In case of adoption, although the recovery of mother is not applicable, there still are many complicated steps and processes that are needed to be accomplished within limited time. Such as, the adoption committee meeting, heath check, police verification and home visit report done by local social agencies. It is followed by DM hearing where parents need to present their case before the District Magistrate to issue the final adoption order for the child. There is also huge effort that needs to be given by parents to win the trust of the new member of the family. Unlike children who join the families by birth, adoptive children need more time to adjust to the new environment, especially if they are above one year of age. These children come from places of trauma. They need assurance, care, warmth and time from parents to help them cope in their new life. An adoptive parent also faces many unique challenges in their new role. It takes a toll mentally when you become parents overnight, no matter how long you have waited for that day to come. It’s a mixture of opposites that most adoptive parents feel when their child comes home. When the long wait is finally over, they realize they are not yet equipped to handle the little one and need a little more time and a little more support from people around them.

Renu frantically started looking for a job where an inclusive parental leave policy for adoptive parents would exist. She shortlisted few companies such as Accenture, Inmobi, Netflix and Adobe where adoption is treated at par biological parenthood and is supported with ample leaves and benefits.

Renu is a fictitious character of course , but in reality there are several such Renus around us trying to find themselves a workplace where their decision to adopt would be at least supported, if not celebrated.

Renu might be imaginary but the companies in her shortlist were real. These are the companies that stand out from other companies for providing equal leave benefits to adoptive parents. Few of them even provide 26 weeks of paid leave if the employee is a primary care giver of the child, irrespective of whether it is a male or a female employee applying for the leave.

These is not the end but beginning of every adoptive parent’s journey where they have to choose between career and child and are desperately looking for an inclusive HR policy at their workplace. As an working adoptive mother myself, here are few suggestions for changes that HRs can do to make the workplace more inclusive for adoptive parents:

- If an employee expresses that she/he is a prospective adoptive parent, first try to understand how far they are from their referral, so that business continuity can be planned effectively. Often, it is uncertain on when exactly we would receive a referral but all prospective parents would have a rough idea on a tentative timeline based on their seniority on the system.

- Adoptive parents need time with their children to gain trust from the child and establish a bond. The leave that they should be entitled to should be at par biological maternity/ paternity policies.

- Adoption leaves should be applicable to male employees too. Just like any male employee is entitled to paternity leaves, same should be offered to adoptive parents. In fact, adoptive fathers should be looked with a different perspective. There are many instances where the applicants are single fathers. In such case, they play the role of father as well as mother and they should be provided more support and days off. I like the way some companies have now come out of the concept of maternity and paternity leaves and instead providing child-care/ parental leave to all their employees.

- Counseling and therapies should be made available for adoptive parents. Pre-adoption counseling is a must for all adoptive parents and it would be a great move by companies if they can facilitate something similar or have a re-imbursement policy if anyone avails it.

- Have more adoptive parents speak about their experience through organized learning sessions so that other employees contemplating adoption has a peer support and understands that the company values their choices no matter how different it is from the main stream. Also, it would remove the social stigma that exists around adoption and help normalize it.

The above list can definitely be expanded and improved based on case studies and interviews with more adoptive parents. Something that companies should take an active initiative going forward. Such shift in mindset will make the corporate world truly inclusive where people from diverse backgrounds and needs would be able to thrive and be able to contribute their best in their day-to-day work life.

Atmaja at Adoptive Parents Meet Cooch Behar

September 2024

Adoptee speaks … Anhiti from Atmaja

Atmaja with Cooch Behar DCPU

Anup Dewanji addressing Adoptive Parents Meet Cooch Behar

যুদ্ধজ্বর - তৃতীয় পর্ব

স্বপন নস্কর

There are no answers , only questions (উত্তর নেই , শুধু প্রশ্ন আছে)

একটি বিখ্যাত গানের কয়েকটি লাইন স্মরণ করে এই পর্ব শুরু করছি...

"Some of us laugh,
Some of us cry,
Some of us lay back - watch the world go by.
Some of us fear,
Some of us hate,
Some of us won't wake up 'till it's too late!"
(Album –Vulture Culture , Band – The Alan Parsons Project)

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে করোনা আসার সাথে সাথেই এই পৃথিবীর পরিস্থিতি বোঝাতে মনে হয় এর থেকে ভালো বর্ণনা পাওয়া যাবেনা। এবং এই কথাটা শুধু আজ নয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় প্রত্যেক অতিমারীতেই এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মানব সভ্যতা এসেছে যেখানে প্রথমেই পৃথিবী স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে ।

পৃথিবীতে করোনা কাল এর সূচনা তার ব্যতিক্রম হল'না বরং অন্তর্জাল এবং উন্নত কারিগরি'র দৌলতে আমরা এক বীভৎস পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম ... আমাদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়ালো এক নতুন ভাইরাস – যার নাম Infodemic । আমরা যারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ তাদের সামনে এলো এক নতুন আতংক – Knowledge Terrorism ।

অবস্থা এতটাই মারাত্মক চেহারা নিল যে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়া গুজব নিয়েও রিভিউ হতে লাগলো , গবেষণা পত্র প্রকাশিত হতে শুরু করল বিভিন্ন বিখ্যাত জার্নালে। তানিয়া লিউইস বলে এক সায়েন্স জার্নালিস্ট যিনি সায়েন্টিফিক আমেরিকা'র একজন সিনিয়র এডিটর ২০২০ সালের আগস্ট মাসেই একটা ডিটেল রিপোর্ট করলেন এইসমস্ত গুজব নিয়ে রিভিউ করে এবং কোভিডকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রধান প্রধান ন'টা মিথ বা ধারণাকে চিহ্নিত করলেন –

মিথ ১) নোভেল করোনা ভাইরাস চীনের ল্যাবরেটরিতে তৈরি একটি কৃত্রিম ভাইরাস

মিথ ২) বিশ্বের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত অংশ ক্ষমতা এবং শক্তি ধরে রাখার জন্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ভাইরাসকে ছড়িয়ে দিয়েছেন

মিথ ৩) নোভেল করোনা ভাইরাস অনেক নিরীহ একটি ভাইরাস ফ্লু'র তুলনায়

মিথ ৪) মাস্ক পড়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই

মিথ ৫) হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন করোনার বিরুদ্ধে কার্যকরী একটি ওষুধ

মিথ ৬) আমেরিকাতে কালো মানুষদের প্রতিবাদ এই করোনা ভাইরাসের সুপার স্প্রেডার হিসাবে কাজ করেছে

(ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ছে ?)

মিথ ৭) করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই করোনা ভাইরাস আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ছে

মিথ ৮) এই ভাইরাসটিকে যদি কোন প্রতিরোধ না করে সম্মুখীন হই আমরা তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা গোষ্ঠী অনাক্রমনতা অর্জন (হার্ড ইমিউনিটি) করতে পারব এবং এই অতিমারির শেষ সেভাবেই হতে পারবে

মিথ ৯) অ্যান্টি ভাইরাস যে কোন ভ্যাক্সিন শরীরে জন্যে নিরাপদ হবেনা এবং এর ফলে করোনা ভাইরাস আরো বেশি করে আমাদের কাবু করে ফেলবে।

এই সমস্ত মিথ গুলো নিয়ে প্রচুর আলোচনা তর্কবিতর্ক হয়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে , সংবাদপত্রে , টিভিতে তাই সেই বিস্তারিত আলোচনায় না ঢুকে আমরা আলোচনার জন্যে প্রথমটি অর্থাৎ সেই বিখ্যাত ষড়যন্ত্র তত্ব এবং শেষের দুটি অর্থাৎ ভ্যাক্সিন বনাম অ্যান্টি ভ্যাক্সিন বিতর্ক বেছে নিলাম। তবে এই আলোচনা করার আগে আমরা আরো একটি রিভিউ এর কথা বলে নেবো যাতে বোঝা যায় যে এই গুজব বা ইনফোডেমিক কতদূর প্রসারিত এবং সমাজের গভীরে প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট। এই রিভিউ এখনো পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে রয়েছে তাই তথ্য সূত্র হিসাবে আমরা এখানে দিচ্ছিনা তবে এখানে আমরা উল্লেখ করছি একটাই কারণে যে এই রিভিউতে বিশ্বের প্রায় ১৪ জন গবেষক একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তুলে ধরেছেন । তাঁরা বলছেন যে আজ পর্যন্ত যত অতিমারী এসেছে তাদের কেন্দ্র করে যে সমস্ত গুজব এবং সামাজিক ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে এমন ষড়যন্ত্র তত্ব নির্মাণ হয়েছে তাদের চারটি মূল প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা যায় – এই শ্রেণীগুলি হ'ল – What ? , How ? Who ? এবং Why ? এইবার চারটি তালিকাতেই একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক

কী?

১) কৃত্রিম উৎস ২) আসলে একটি জৈব অস্ত্র ৩) অতিরঞ্জিত ফ্লু ৪) হোয়াক্স ৫) মেডিকাল কন্সপিরেসি ৬) মাইক্রোচিপ ৭) ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তৈরি ।

কীভাবে?

১) ৫ জি নেটওয়ার্ক ২) গোপন তথ্য ৩) জোর করে ইচ্ছাকৃত ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া ৪) দুর্ঘটনা (ল্যাব লিক থিয়োরি) ৫) ভুল তথ্য পরিবেশন অথবা তথ্য বিকৃতি ৬) কোভিড বিধি নিষেধের মাধ্যমে

কে?

১) বিভিন্ন সরকার ২) চীন ৩) ফার্মা কোম্পানি ৪) শক্তিশালী কোন গোষ্ঠী ৫) আমেরিকা ৬) বিভিন্ন মাধ্যম ৭) বিজ্ঞানীরা ৮) বিল গেটস ৯) স্বাস্থ্য পরিসেবার কর্তাব্যক্তিরা ১০) বাণিজ্যিক সংস্থা ১১) ডেমোক্র্যাট (আমেরিকার ক্ষেত্রে) ১২) সেনাবাহিনী ১৩) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO ১৪) ডোনাল্ড ট্রাম্প

কেন ?

১) আর্থিক সুবিধা ২) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৩) অর্থনীতি কে বেসামাল বা বিপর্যস্ত করে দেওয়া ৪) রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ৫) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ৬) স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ৭) ট্রাম্প যাতে অস্বস্তির মধ্যে পড়েন (এটা আমেরিকার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য) ৮) জনগনের উপরে নজরদারী করার জন্যে ৯) নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বা কোন তথ্য গোপন করার জন্যে ১০) রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের যুদ্ধ ১১) বাণিজ্যিক কারণে জোর করে টিকা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ১২) নতুন ব্যবস্থা বা শাসন (New Order such as … One World One Order Theory) ১৩) পরিবেশ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ১৪) জনগণের উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ।

ভাইরাসের চেয়েও দ্রুতগামী এবং ছোঁয়াচে এইসব ষড়যন্ত্র তত্ব কিন্তু এই উপরের তালিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা … এই তালিকা শুধু এখন অবধি যে সমস্ত অতিমারী আমরা দেখেছি তার ভিত্তিতে তৈরি । কিন্তু মানুষ যেহেতু উত্তেজনা নিতে ভালোবাসে , ছড়াতে ভালোবাসা তাই আগামী দিনে আরো প্রচুর তত্ব এই তালিকায় আমরা দেখতে পাবো । আপাতত আমরা আমাদের এই মুহূর্তের সঙ্কট করোনা ঘিরে যে সমস্ত তত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে থেকে প্রধান তিনটি আলোচনার বিষয় খুঁজে নিতে চাই – ১) করোনা ভাইরাস একটি কৃত্রিম ভাইরাস না প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল ২) ভ্যাক্সিন বিতর্ক এবং করোনা ঘিরে বাণিজ্য এবং ৩) এই অতিমারীর ভবিষ্যৎ ।

প্রথমেই আসি ষড়যন্ত্রের তত্বে যেখানে বলা হচ্ছে যে চীনের উহান শহরের ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিতে এই ভাইরাস কৃত্রিম ভাবে তৈরি হয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে একটি জৈব অস্ত্র হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চীনের পক্ষ থেকে অথবা চীনের এই ল্যাবোরেটারি থেকে কোনভাবে অসাবধানে এটা ছড়িয়ে গেছে এই তত্ব নিয়ে । এবং এর পরে চীনের অদ্ভুত নীরবতা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার বিপজ্জনক প্রবণতা। উদ্দেশ্য বিশ্বের উপরে চীনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ।

এই বিষয়টির উপরে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে কারণ এই কথা যারা যারা বলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মন্টেনিয়ারের মত নোবেল জয়ী (HIV ভাইরাস আবিষ্কারের জন্যে তিনি বিখ্যাত । ২০০৮ সালে তিনি মেডিসিনে বা ফিজিওলজিতে নোবেল পান আরো দুজনের সাথে একসাথে। তিনি এবং সিনৌসি বলে একজন যুগ্ম ভাবে HIV ‘র জন্যে এবং হেরাল্ড হাউসেন বলে আর একজন পান হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস আবিষ্কারের জন্যে যে ভাইরাস সারভাইকাল ক্যানসারের কারণ) যিনি ভাইরোলজিতে বিশ্বের প্রথম সারিতেই উল্লেখযোগ্য একটি নাম। তিনি এই ভাইরাসটির কৃত্রিম উৎস নিয়ে মতামত দেওয়ার সাথে সাথে আরো একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন ভ্যাক্সিন নিয়ে।

এছাড়া আরো একটি আমরা উল্লেখ করব এখানে তিনি হলেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের একজন নামকরা ভাইরোলজিস্ট – তিনিও কিছুদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ভ্যাক্সিন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন এবং করোনাকে ঘিরে ভয় দেখিয়ে ভ্যাক্সিন থেকে বাণিজ্যিক লাভ করার একটা তত্বের দিকে ইঙ্গিত করেন।

আমরা ভ্যাক্সিন নিয়ে আলোচনায় পরে আসব আপাতত এই করোনার কৃত্রিম উৎস এবং চীনের উহান ল্যাবোরেটারির প্রতি যে অভিযোগ সেই প্রসঙ্গে কথা বলব যার কথা আমরা শুনেছিলাম প্রফেসর মন্টেনিয়ারের মুখে এবং প্রথম দিকে আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁর স্বাস্থ্য উপাদেষ্টা ডঃ ফাউচি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে

সেই অভিযোগের গুরুত্ব না দিলেও ডঃ ফাউচি সম্প্রতি আবার নতুন করে এই ল্যাবোরেটারি থেকে লিক হবার তত্ত্বের অনুসন্ধান করার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রফেসর মন্টেনিয়ারের নামের সাথে প্রথম থেকেই বিতর্ক জড়িয়ে থাকে এই HIV 'র আবিষ্কার নিয়ে রবার্ট গ্যালো নামে আরো একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সঙ্গে। এছাড়াও ব্যাক্টেরিয়াল DNA ভাইরাস থেকে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক সিগন্যাল বিচ্ছুরণের কথা বলে এবং পরে আবার হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে সওয়াল করে তিনি সতীর্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কিত হয়ে পড়েন । আমরা সেই বিস্তারিত আলোচনায় যাবনা কারণ এখানে তা প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে উল্লেখ করা হল শুধুমাত্র তাঁর বিতর্কিত ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্যে।

ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার প্রভাবের ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা যখন চীনের উহান ল্যাবোরেটারিতে একটি অনুসন্ধানী দল পাঠায় তার পরেই প্রফেসর মন্টেনিয়ার এই কৃত্রিম উৎস সম্মন্ধে তিনি যে দুটি যুক্তি দিয়েছিলেন তাহল – ১) এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে HIV এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণুর দুটি উপাদান পাওয়া গেছে ২) স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই যদি এই করোনা ভাইরাস বিবর্তিত হয়ে এসে থাকে তাহলে এই দুটি উপাদান এলো কীভাবে ?

বিজ্ঞানী মহলে এই তত্ত্বটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে অনেক ভাইরাসের ক্ষেত্রেই জিন সিকোয়েন্সিং এর মধ্যে এইধরনের সাদৃশ্য প্রচুর দেখা যায় । বিষয়টি অনেকটা এ'রকম – একটি গল্পে অথবা প্রবন্ধে ব্যবহৃত কিছু শব্দবন্ধ যদি অন্য আর একটি প্রবন্ধে বা গল্পে থাকে তাহলেই বলা যায়না যে একটি আর একটির নকল বা কপি। কাজেই HIV / AIDS এর ভাইরাস ল্যাবোরেটারিতে তৈরি করতে গিয়ে এই করোনা ভাইরাস তৈরি হয়ে গিয়েছে প্রফেসর মন্টেনিয়ারের এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানী মহলে কোন গুরুত্বই পায়নি।

আসুন এবার একটু উহান ল্যাবোরেটারির দিকে তাকানো যাক । কী করছিলেন এখানে বিজ্ঞানীরা ? যেদিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে সমস্ত বিশ্ব ?

একটি ভাইরাসের মহামারী হবার তিনটি স্তর আছে – Outbreak , Epidemic এবং Pandemic । উহান ল্যাবোরেটারিতে ইউ এস এ থেকে এই ভাইরাসের গবেষণার জন্যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ভাইরাস মানব দেহে প্রথমবার সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকলে তার গতি প্রকৃতি এবং চেহারা কেমন হয় সেটা দেখার এবং চিহ্নিত করার জন্যে । উদ্দেশ্য একটাই ভাইরাসটিকে চিহ্নিত করতে পারলে তার সম্ভাব্য প্রতিষেধক কী হতে পারে যাতে সে আউটব্রেক বা প্রাদুর্ভাবের পরে মহামারী এবং তারপরে অতিমারী অবধি যাওয়া কিছুটা হলেও সংযত বা প্রতিহত করা যায়। ভাইরোলজিতে এই ধরণের গবেষণা ভীষণ ভাবে স্বীকৃত এবং এটা বিজ্ঞানী মহলে গোপনীয় নয়।

বাদুড়ের রক্ত নিয়ে এই গবেষণার মূল কারণ হ'ল বাদুড় একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা উড়তে পারে এবং বাদুড়ের রক্তে এ'রকম অজস্র ভাইরাস নিয়েও বাদুড় বেঁচে থাকে কোনরকম অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়না তার মধ্যে । বাদুড় স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় প্রথম স্থানে থাকা ইঁদুরদের পরে। বাদুড়ের প্রায় ১২০০ বিভিন্ন ধরণের প্রজাতি আছে পৃথিবীতে যাদের প্রধানত চীন এবং আমাজনের রেন ফরেস্ট অঞ্চলে দেখা যায়। আমেরিকার ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ এই বাদুড়ের নমুনা সংগ্রহ এবং গবেষণা করার কাজে অর্থ সহায়তা করে আসছে অনেকদিন ধরেই । এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল এই ভাইরাসের জেনোম অর্থাৎ জেনেটিক ইনফরমেশন পাওয়া যাতে বোঝা যায় ভাইরাসের সংক্রমণ করার পদ্ধতি , ভাইরাসের গঠন , উপাদান হিসাবে আর এন এ এবং ডি

এন এ , সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড এবং ডাবল স্ট্র্যান্ডেড , এছাড়া অন্য কী কী নিউক্লিও প্রোটিন অথবা ফ্রেম শিফট প্রোটিন আছে ইত্যাদি সম্মন্ধে বুঝে নেওয়া , জেনে নেওয়া । এই সবই এই আশায় যাতে বিজ্ঞানীরা এমন একটা ভ্যাক্সিন

খুঁজে বের করতে পারেন যেটা এই ভাইরাসকে থামাতে পারবে এপিডেমিক অথবা তারপরে প্যান্ডেমিক হওয়ার থেকে।

এবার যদি একজন ভাইরোলজিস্টকে বলা হয় এমন একটা ভাইরাস সৃষ্টি করো যার মধ্যে কিছু বিশেষ গুন থাকবে যাতে সে প্রচণ্ড সংক্রামক অথবা কম সংক্রামক হবে , ব্রেনকে আক্রমণ করবে অথবা লিভারকে বা লাংকে আক্রমণ করবে । তাহলে একজন ভাইরোলজিস্টের কাছে সেটা একটা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ভাইরোলজি নিয়ে অনেক কিছু তথ্য আমাদের কাছে থাকলেও হিউম্যান ইমিউনিটি সম্মন্ধে প্রায় বেশিটাই আমাদের অজানা। জীববিজ্ঞান অথবা বায়োলজি সাধারণ রসায়ন শাস্ত্র বা কেমিস্ট্রির থেকে অনেক গুণ জটিল বিষয় । কাজেই এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রধান প্রয়োজন যে ভাইরাসের কৃত্রিম সৃষ্টি সেটাই একটা কল্প কাহিনী মাত্র ।

এই অবধি বলেও একটা কথা হয়ত তবু স্বীকার করতে হবে যে উহানের ল্যাবোরেটারিতে এই ভাইরাসের নির্মাণ হয়েছে এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে অসম্ভব হলেও কোনভাবে অসাবধানতা বশতঃ এই ল্যাবোরেটারি থেকে ভাইরাসটির সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায়না এখনো অবধি। এর অন্যতম কারণ চীনের অদ্ভুত আচরণ। প্রথমতঃ ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবের পরে বেশ কিছুদিন সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা না করা এবং তার পরেও যখন বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা প্রতিনিধি দল পাঠায় তাঁদের কাছে সমস্ত তথ্য তুলে না দেওয়া এবং ল্যাবোরেটারির মধ্যে অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অবাধ অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বেশ সোচ্চার ভাবেই। প্রসঙ্গত এই অভিযোগ আগেও উঠেছিল ২০০২ সালে করোনা ভাইরাসের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে। যে কোন সময়ে একটি ভাইরাস নিয়ে তথ্য প্রকাশ্যে মেডিকাল জার্নাল বা অন্য কোন ফোরামে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানী মহলে সেই বিষয়ে আলোচনা , পিয়ার রিভিউ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করা। চীন এই সমস্ত বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় করার ফলে বিজ্ঞানের সেই বৃহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চীনকে কীভাবে বাকি বিশ্ব এই বিষয়ে বাধ্য করবে এটা কিন্তু মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন । সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ দেশগুলি চীনের উপর বাণিজ্যিক ভাবে নির্ভরতা পুরোপুরি কমাতে পারবে। বাজারকে চীনজাত দ্রব্য মুক্ত করার সেই স্বপ্ন আপাতত সুদূরে ।

প্রশ্নটি কিন্তু রয়েই গেল ... এই নতুন করোনা ভাইরাসের আদি উৎস কোথায় , কোনখানে ?

যদিও এই বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি এবং সত্যি কথা বলতে একটি ভাইরাসের আদি উৎস সন্ধান এতটাই জটিল যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় ... প্রথম করোনা ভাইরাস SARS CoV যা ২০০২ সালে এসেছিল চীনে তার উৎস হিসাবে বাদুড়কে চিহ্নিত করতে সময় লেগেছিল প্রায় ১৪ বছর আর এই SARS CoV 2 কীভাবে বাদুড় থেকে মানুষের শরীরে এলো সেটা নিয়ে আমরা হয়ত আরো বেশ কিছু বছর পরে কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারব । তবে এখনো অবধি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা বাদুড়কে প্রাইমারী রিজার্ভার অফ SARS CoV 2 এবং একটি ইন্টারমিডিয়েট রিজার্ভার হিসাবে Pangolin অথবা বনরুই এর কথাই ভাবছেন এবং সুপার স্প্রেডার হিসাবে উহান শহরের হুয়ানান সী ফুড মার্কেট এর দিকে ইঙ্গিত করছেন । তবে এইসবই এখনো পর্যন্ত অনুমান এবং অসমাপ্ত অনুসন্ধান । বাদুড় থেকে ডাইরেক্ট মানুষের শরীরে সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা খুবই কম ... কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট রিজার্ভার হিসাবে Pangolin অথবা বনরুই নিয়েও শেষ সিদ্ধান্তে

পৌঁছাতেও পারেননি এখনো বিজ্ঞানীরা । তাই নোভেল করোনা ভাইরাসের উৎস কোথায় ? এই প্রশ্নটিই শুধু আছে এখনো কোন উত্তর নেই।

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.

Bertrand Russell

এই শেষ পর্যায়ে এসে আমার ভীষণ মনে হচ্ছে বিজ্ঞান এবং বিশ্বাস আর সেই সঙ্গে অপবিজ্ঞান অথবা অন্যান্য বিষয়ের সাথে যে মূল তফাৎ সেটা বোঝার খুব প্রয়োজন। এবং তাইজন্যেই প্রথমেই আমি বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যেতে চাই।

বিজ্ঞান কী সেটা বলতে গিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কার্ল পপারের দেওয়া সংজ্ঞা । তাঁর মতে বিজ্ঞানের সমস্ত ধারণা বা তত্ত্বই অস্থায়ী এবং এগুলো শুধুমাত্র আপাত গ্রহণযোগ্য তথ্য। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় তিনি ফলসিফিকেশনকে একটি বিশেষ নির্ণায়ক উপাদান হিসাবে দেখেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ব সেটাই যাকে ফলসিফাই বা ভুল প্রমান করা যেতে পারে (অথবা না করা যেতে পারে ?) ।এই সংজ্ঞা দিয়ে তিনি সম্ভবত বলতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞানের কোন তত্বকে সত্যি বলে বিশ্বাস না করে সেটাকে মিথ্যা করার চেষ্টাই বিজ্ঞান। অর্থাৎ বিশ্বাস নয় বিজ্ঞানের প্রকৃত কাজ হল বিজ্ঞানের তত্বগুলিকে আপাত গ্রহণযোগ্য তথ্য হিসাবে ধরে নিয়ে অবিরাম প্রশ্ন করে যাওয়া।

বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি আমার নিজের খুব পছন্দের তার প্রথম কারণ হল এটা খুবই সহজ সরল সংজ্ঞা আমাদের মত সাধারণ মানুষদের বোঝার পক্ষে। আর দ্বিতীয় কারণ হল এটা খুব স্পষ্ট ভাবে আমাদের বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিষয়ের এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল অপবিজ্ঞান বা সিউডোসায়েন্সের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি – ভ্যাক্সিন বিতর্ক যা এই মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য।

প্রফেসর মন্টেনিয়ার (দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন এই পর্বটি লেখার সময়েই) ভ্যাক্সিন নিয়ে যেটা বলেছিলেন তা একটা ভিডিও মারফৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এবং প্রচার হতে শুরু হয় যে ১) তাঁর মত একজন নোবেল জয়ী বলেছেন যে যারা যারা এই করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন নেবে তারা দু'বছরের মধ্যেই মারা যাবে । ২) এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত একটি বিশাল ভুল সিদ্ধান্ত এবং এরজন্যে মানুষের শরীরে এই ভ্যাক্সিন ভাইরাসটির আরো নতুন ভ্যারিয়ান্ট সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এবং এই সাথে আরো একটি মারাত্মক দাবী করেন তিনি যে যারা যারা ভ্যাক্সিন নেবে তারা অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এর ফলে আরো বেশী করে সংক্রামিত হয়ে পড়বে ।

ভিডিওটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল প্রথম কথাটি তিনি বলেননি ...কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যটি তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে – ১) ভ্যাক্সিন নেবার ফলে মানুষের শরীরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে ভাইরাসের আরো বেশী করে মিউটেশন হবে ২) ভ্যাক্সিন নেওয়া মানুষ আরো বেশী করে সংক্রামিত হবে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এর ফলে। এবং ৩)এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ একটি বিরাট ভুল মেডিক্যাল ডিসিশন।

প্রফেসর মন্টেনিয়ারের বক্তব্য মাথায় রেখেই আমরা এবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি আপাত গ্রহনযোগ্য তথ্যের উপরে চোখ রাখি। পৃথিবীর বুকে বেশ কিছু মারাত্মক ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়া জনিত অসুখ যারা এই কিছুদিন আগেও দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারা হল – ডিপথেরিয়া , হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি অথবা HIB , হেপাটাইটিস –এ , হেপাটাইটিস – বি , চিকেন পক্স , শিংলেস বা হারপিস জুস্টার , হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস , সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা , হাম , মেনিঞ্জোকক্কাল ডিজিস , মাম্পস , হুপিং কাশি , নিউমোকক্কাল ডিজিস , পোলিও , রোটা ভাইরাস , রুবেল্লা বা জার্মান হাম , টিটেনাস এবং জলাতঙ্ক ।

উপরে উল্লেখ করা এই সমস্ত অসুখের অধিকাংশই ভাইরাস জনিত অসুখ এবং বেশ কিছু দিন পৃথিবীর বুকে তান্ডব চালাবার পরে আজ তাদের প্রভাব একেবারেই কমে গেছে এবং তার পিছনে সবথেকে বড়ো ফ্যাক্টর হল আমরা এই সমস্ত অসুখের ভ্যাক্সিন পেয়েছি এবং প্রয়োগ করতে পেরেছি। তাই প্রফেসর মন্টেনিয়েরের প্রথম বক্তব্যটি অর্থাৎ ভ্যাক্সিনের প্রয়োগের জন্যে ভাইরাস আরো বেশী করে মিউটেটেড হয়ে নতুন নতুন ভ্যারিয়ান্ট তৈরি করে ফেলবে এই বক্তব্যটির কোন সত্যতা আমরা খুঁজে পেলাম না।

এবার আসি দ্বিতীয় বক্তব্যে - ভ্যাক্সিন নেবার পরে মানুষ যখন যে রোগ প্রতিরোধের জন্যে ভ্যাক্সিন নেওয়া হল সেই একই রোগে আক্রান্ত হয় তখন আমরা তিন ধরনের পরিস্থিতি দেখি –

১) মৃদু উপসর্গ – সাধারণত এটা দু থেকে তিন দিনের জন্যে স্থায়ী হয় আর নিজে থেকেই চলে যায়। এই উপসর্গ হলে আমরা বুঝতে পারি যে ভ্যাক্সিন প্রকৃতই কাজ করছে শরীরে।

২) ব্রেক থ্রু ইলনেস – এই ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন নেওয়া ব্যক্তি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে , অনেক সময় হসপিটালে নিয়ে যাবার মত পরিস্থিতি হয়ে যায় ... এবং কোন কোন সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয় সেই ব্যক্তির।

৩) অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট – এই ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন তার টার্গেট অসুখটির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনা । বরং ভ্যাক্সিন এর ফলে যে অ্যান্টিবডি প্রয়োগ করা হচ্ছে তারা গিয়ে ভাইরাসটির সাথে মিলিত হয়ে তাকে শরীরের কোষে প্রবেশ করতে বেশী করে সাহায্য করে।

প্রথম দুটি ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনা। এবং আমরা করোনা ভ্যাক্সিন নেবার পরে বেশ কিছু উদাহরণ পেয়েছি এই দু ধরণের প্রতিক্রিয়ার ।

তৃতীয় যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে ... তা ভ্যাক্সিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ বিরল । এর আগে আমরা দু'তিনটি ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখেছি । তারমধ্যে প্রথম হল RSV (Respiratory Syncytial Virus) যে ভাইরাস বাচ্ছাদের শরীরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত করে। এই ভ্যাক্সিন তৈরি করা হয় ভাইরাসটিকে পিউরিফাই করে ফরম্যাল্ডিহাইড দিয়ে নিস্ক্রিয় করে। ক্লিনিকাল ট্রায়াল করার সময়ে বেশ কিছু বাচ্ছা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ... ভ্যাক্সিনটি ক্লিনিকাল ট্রায়াল থেকেই তুলে নেওয়া হয় এবং আর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হয়নি।

এছাড়াও মিসলস ভ্যাক্সিনের একেবারে প্রথম দিকের এর একটি ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যখন বেশ কিছু বাচ্ছা গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে । এই ভ্যাক্সিনও তৈরি করা হয়েছিল মিসলস ভাইরাসকে ফরম্যালডিহাইড দিয়ে নিস্ক্রিয় করে। কিন্তু ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ফলাফল দেখে এই ভ্যাক্সিন তুলে নেওয়া হয় । এরপরে ভ্যাক্সিন হিসাবে মিসলস

ভাইরাসের দুর্বল কিন্তু জীবিত স্পেসিমেন প্রয়োগ করা হয় বাচ্ছাদের শরীরে ... এবং এরপরে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইনি আমরা। বর্তমানে এই ভ্যাক্সিনটিই ব্যবহার করা হচ্ছে।

খুব সম্প্রতি ডেঙ্গি ভাইরাসের ভ্যাক্সিন এর ক্ষেত্রে আমরা ফিলিপিনসের প্রায় ৮০০০০০ লক্ষ বাচ্ছার শরীরে প্রয়োগ করার পরে ১৪টি বাচ্ছা ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । অনুমান করা হয় যে এই ক্ষেত্রে একেবারে কম বয়সী বাচ্ছাদের শরীরে ইমিউনিটি তৈরি না হয়ে এই অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এর প্রভাব পড়েছিল। এরপর একেবারে কম বয়সী বাচ্ছাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উপরে বলা এই তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আমরা আর কোথাও এই ADE বা অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এর প্রতিক্রিয়া দেখিনি। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে প্রফেসর মন্টেনিয়ার এই আশঙ্কা প্রকাশ করার পরেও এই করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিনের ক্লিনিকাল ট্রায়াল অথবা জনসাধারণের উপরে প্রয়োগ করার ফলে কোথাও কোন উদাহরণ আমরা দেখিনি এই অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এর।

এবার আসা যাক আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই একজন নামকরা ভাইরোলজিস্ট ডঃ অমিতাভ নন্দীর বক্তব্যে। একটি বিখ্যাত টিভি চ্যানেলে তিনি যে কথা বললেন তার সারমর্ম হল – ১) একটা সার্বিক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যেটা তাঁর কাছে ষড়যন্ত্র মনে হয়েছে (তিনি স্পষ্ট করে বলেননি তবে সম্ভবত ভ্যাক্সিন বিক্রির উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র হয়ত এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন) ২) ভ্যাক্সিন না নিলেও ৮০ শতাংশ মানুষ সংক্রামিত হচ্ছেন না । অন্যদিকে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ৮০ শতাংশ । তাহলে শুধু শুধু ভ্যাক্সিন নেবে কেন কেউ ? ৩) মাত্র একবছরের মধ্যেই কীভাবে ভ্যাক্সিন তৈরি হতে পারে বিশেষ করে RNA ভাইরাসের ভ্যাক্সিন এত কম সময়ের মধ্যে কী করে চলে আসে ?

বলাই বাহুল্য তাঁর মত একজন নামকরা ভাইরোলজিস্টের পপুলার টিভি চ্যানেলে বলা এই কথা গুলি ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এই তিনটি বক্তব্যের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ষড়যন্ত্র তত্ব নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলার নেই কারণ আমরা এর আগের পরবে এই কন্সপিরেসি থিয়োরি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য অর্থাৎ ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নিয়ে যেটা বললেন সেটা একজন ভাইরোলজিস্ট বলছেন এটা মেনে নিতে বেশ কষ্টই হয় আমাদের। কারণ তিনি নিশ্চয়ই এটা ভালো করে জানেন যে একটা ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ৮০ শতাংশ বললে সেটা এইরকম কোন সরলরৈখিক হিসাব নয় যে একশো জন মানুষকে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে ৮০ জনের হবেনা আর ২০ জনের হতে পারে। এটা আরো জটিল হিসাব তবে যদি খুব সহজ করে বুঝতেই হয় তাহলে এভাবে বলা যায় –

ক্লিনিকাল ট্রায়াল যখন হয় তখন যারা ভলান্টিয়ার (স্বেচ্ছায় পরীক্ষামূলক ভ্যাক্সিন নিতে রাজি) হচ্ছেন তাঁদের দুভাগে ভাগ করা হয় (তাঁদের অজ্ঞাতে) – একদল থাকেন যাদের শরীরে ভ্যাক্সিন নয় দেওয়া হচ্ছে নিরীহ স্যালাইন ওয়াটার । কিন্তু তাঁরা জানছেন যে ভ্যাক্সিনই দেওয়া হচ্ছে তাঁদের শরীরে । এবং আর এক দল থাকছেন যাদের শরীরে ভ্যাক্সিন যাচ্ছে । ভলান্টিয়ার যারা তাঁরা কখনোই জানতে পারেন না যে তাঁদের মধ্যে কারা ভ্যাক্সিন পাচ্ছেন আর কারা নিরীহ স্যালাইন । আবার যারা দিচ্ছেন তাঁদের কাছেও এই ভলান্টিয়ারদের কোন তথ্য থাকেনা । এবার একটা নির্দিষ্ট সময় এক্সপোজার নেবার পরে তাঁদের শরীরে টেস্ট করা হয় ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে কিনা। ধরা যাক ১০০ জন ছিলেন যাদের শরীরে নিরীহ স্যালাইন গেল ... তাঁদের মধ্যে টেস্ট করে দেখা গেল ৯০ জন ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন। আর অন্য ১০০ জন যাদের শরীরে ভ্যাক্সিন গেছে তাঁদের মধ্যে ১০ জন আক্রান্ত হলেন ভ্যাক্সিন নেওয়ার পরেও । এই ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা হবে ৯০ – ১০ অর্থাৎ ৮০ শতাংশ । যদিও

প্রকৃত পদ্ধতি আরো একটু জটিল তবু বোঝার সুবিধার জন্যে এইটুকু আমাদের জন্যে যথেষ্ট । টিভি চ্যানেলে যে কথা বলা হল সেই হিসাব কিন্তু একেবারেই আলাদা।

এবার তৃতীয় বক্তব্যটি বোঝা যাক । ভ্যাক্সিন তৈরি হতে একবছর সময় কী যথেষ্ট ? বিশেষ করে RNA ভাইরাসের ভ্যাক্সিন । সত্যি কথা বলতে এই কথায় তত্বগত ভাবে কোন ভুল নেই । কিন্তু সম্ভবত একটা বিষয় ভুলে যাওয়া হয়েছে এই কথা বলার সময় – যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর আগে দুবার এসেছে এবং এই অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রতিষেধক এবং ভ্যাক্সিন এর খোঁজ তখনই শুরু হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে।

একথা সত্যি যে বিজ্ঞান কোন রূপকথা বা ম্যাজিক নয় যে আকাশের শূন্যতা থেকে সে জন্ম দেবে একটি ভ্যাক্সিনের । বিজ্ঞান অনেক নীরস , শুষ্ক এবং ক্লান্তিকর দীর্ঘ অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানে এসে পড়ে অজস্র তথ্য যাদের মধ্যে হয়ত আপাতদৃষ্টিতে কোন বৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায়না। আর সম্ভবত এই জন্যেই সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশী গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তবু একটু খতিয়ে দেখা যাক এই ভ্যাক্সিন তৈরির পিছনের ইতিহাস।

সম্প্রতি আমরা দেখলাম ফাইজার (Pfizer) একটি নতুন করোনা প্রতিষেধক বা ড্রাগ এনেছে যার নাম Paxlovid । এই সাফল্য কিন্তু আকাশ থেকে পড়া কোন গল্প নয়। ২০০২ সালে যখন প্রথম করোনা ভাইরাসের (SARS CoV-1) প্রাদুর্ভাব হয় তখনই ফাইজার এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক তৈরি করার কাজ শুরু করে । কিন্তু সেই প্রথম করোনা ভাইরাস কিছুদিন পরেই চলে যায় আর ফাইজার ও তাদের গবেষণার কাজ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সেই গবেষণার সমস্ত তথ্য থেকে যায় । ২০২১ সালে যখন ফাইজার নতুন করে এই ওষুধ তৈরি করতে শুরু করে তাদের জন্যে এই প্রায় কুড়ি বছর আগের সমস্ত তথ্য ভীষণ ভাবে সাহায্য করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই ওষুধ তৈরি করে ফেলতে।

ঠিক একই রকম ভাবে ... এই mRNA ভাইরাসের ভ্যাক্সিনও কিন্তু কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষে আসেনি আমাদের কাছে । এবং সত্যি কথা বলতে এই করোনা অতিমারিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা সবথেকে বড়ো আবিস্কার হল এই mRNA ভাইরাসের ভ্যাক্সিন । যার প্রস্তুতির ইতিহাস কিন্তু কয়েক দশক আগে থেকেই শুরু হয়েছে।

একটু একটু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসা তথ্য এবং তত্ব যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছিল তখন হয়ত আমরা ভাবতেও পারিনি একদিন এই সমস্ত কাজই একদিন একসঙ্গে এসে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে শতাব্দীর অন্যতম অতিমারি এই করোনা ভাইরাসের লাগাম টেনে ধরবে।

এইপথে প্রথম আলোর দেখা দেয় যখন কানাডাতে বায়োটেকনোলজিকাল সংস্থা গুলো জিন থেরাপীর ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের জন্যে জিন রিপেয়ারিং বা জিন মডিফিকেশন করার জন্যে দুর্বল বা ভঙ্গুর জিনের অণু সুরক্ষিত করে রাখার একটা রাস্তা খুঁতে শুরু করে যাতে সহজে নিরাপদে মানুষের শরীরে এই কণাকে প্রতিস্থাপিত করা যায়।

এরপরে ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে আমেরিকা যখন HIV বা AIDS এর ভ্যাক্সিন আবিস্কারের জন্যে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প শুরু করে তখন একদল বিজ্ঞানীরা সেই বহু আলোচিত স্পাইক প্রোটিনকে (যে স্পাইক প্রোটিন ভাইরাসকে হোস্টের শরীরের কোষে প্রবেশ করার জন্যে প্রধান ভুমিকা নেয়) টার্গেট করার প্রয়াস নেন। HIV বা AIDS এর ভ্যাক্সিন অনুসন্ধানের এই প্রকল্প তেমন সাফল্যের মুখ দেখতে পেলোনা হয়ত কিন্তু এই সব গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশেষ করে ডঃ গ্রাহাম (Barney S Graham) বলে এক ভাইরোলজিস্ট

এবং গবেষকের স্পাইক প্রোটিন নিয়ে কিছু কাজ একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সাহায্য করে যার ফলে এই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে সঠিক ভাবে সনাক্ত বা চিহ্নিত করতে পারা গেল আজ।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে এই করোনা ভ্যাক্সিনের আবিষ্কারের নেপথ্যে যে গবেষণা সেটা আজ এই মুহূর্তে নয়, শুরু হয়েছে আজ থেকে বহুদিন আগেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায়। ডঃ নন্দীর মত একজন ভাইরোলজিস্ট সেটা জানবেন না এমন কিন্তু হবার কথা নয়। যাক এবার এই mRNA ভ্যাক্সিনের আবিষ্কার নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানী মহলে বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই এই mRNA ভাইরাস বা তার প্রতিরোধে ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ চলেছে। এর অন্যতম কারণ হল একটা ভাইরাসকে তার প্রতিলিপিকরণের সময়েই যদি প্রতিরোধ করা যায় তাহলে সেটা অনেক বেশী কার্যকর হয় পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস প্রোটিন প্রতিরোধ করার থেকেও। সহজ ভাষায় বলতে গেলে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে ফেলা।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ কাজে ততটা সহজ হলনা । প্রথম বাধা এলো আমাদের রক্তের মধ্যে যে অতন্দ্র প্রহরা ব্যবস্থা রয়েছে সেখান থেকে । এই প্রহরা ব্যবস্থা সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে কোন ফরেন সোর্স থেকে RNA এসে ঢুকে পড়ল কিনা। এবং এইরকম কোন অনুপ্রবেশকারী RNA দেখলেই তাকে বিনষ্ট করে ফেলে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাহলে কী ভাবে এই mRNA প্রতিরক্ষার কড়া নজর এড়িয়ে কোষের অভ্যন্তরে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাবে ?

এই রকম একটা অবস্থায় মঞ্চে এলেন – ক্যাটালিন ক্যারিকো (Katalin Kariko) সঙ্গে তাঁর পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির সতীর্থ ড্রিউ ওয়েস্ম্যান (Drew Weissman) । ক্যাটালিন আবিষ্কার করলেন যে যদি RNA এর মধ্যেকার AUCG কোডের স্বাভাবিক ইউরিডাইন অর্থাৎ U কে কৃত্রিম সিউডোইউরিডাইন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয় তাহলে এই mRNA শুধু যে রক্তের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারে তা নয় … একই সাথে সে যখন কোষের অভ্যন্তরে পৌঁছায় তখন এই সিউডোইউরিডাইনকে শরীর স্বাভাবিক ইউরিডাইন হিসাবেই ধরে নেয় বা সনাক্ত করে। অর্থাৎ একঢিলে দুই পাখী মারা হয়ে গেল এই ভাবে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ক্যাটালিনের এই কাজ প্রথম দিকে বিশেষ সমাদর পায়নি । তাঁর রিসার্চের অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল … এমন কি তাঁকে প্রোমোশন

না দিয়ে উল্টে নীচের পদে ডিমোট করা হয় ১৯৯৫ সালে। এরপরে ১৯৯৭ সালে ক্যাটালিনের সাক্ষাৎ হয় ড্রিউ ওয়েস্ম্যানের সাথে … এবং ২০০5 থেকে ২০১৩ একের পর এক রিসার্চ পেপার বের হতে থাকে এই দুজনের হাত দিয়ে। তাই এই mRNA ভ্যাক্সিন কোন আকাশ থেকে মাটিতে পড়া দৈবিক ঘটনা নয় … বহুদিন আগে থেকেই তার বীজ বপন হয়ে গেছে বিজ্ঞানের কর্মশালায় ।

প্রশ্ন হল এই mRNA নাহয় প্রস্তুত হল শরীরের কোষের অভ্যন্তরে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ার জন্যে । কিন্তু তাকে কীভাবে সুরক্ষিত করে শরীরের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে রক্তস্রোত থেকে বাঁচিয়ে যেভাবে ভাইরাস ফ্যাটি অ্যাসিড এর আস্তরণের মধ্যে দিয়ে হোস্ট কোষের মধ্যে প্রবেশ করে ? এই কাজটা করা হল লিপিড ন্যানো পারটিকেল দিয়ে । যদিও এই লিপিড ন্যানো পারটিকেল সংরহ করা বিভিন্ন উপাদান থেকে বেশ কঠিন । ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বায়োলজিক্যাল ফ্যাকাল্টি একটা কোম্পানি খুলে এই লিপিড ন্যানো পারটিকেল তৈরি করা শুরু করেছে। তবে বৃহৎ ভাবে উৎপাদন এখনো শুরু করা যায়নি তবে আর কিছু নাহোক এই টেকনোলজি অন্তত এখন আমাদের হাতে এসেছে। আরো একটা কথা আমাদের জানার যে মডারনা অথবা ফাইজার এই দুই সংস্থার লিপিড ন্যানো পারটিকেলের উপাদান আলাদা । তার জন্যেই ফাইজারের তৈরি ভ্যাক্সিনকে মডারনার তুলনায় অনেক বেশী

ঠান্ডায় রাখতে হয় সুরক্ষিত রাখার জন্যে। নাহলে এই ভ্যাক্সিনের কম্পোজিশন ভেঙে যায় তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেলেই।

আবিষ্কারের গল্প কিন্তু শেষ হয়নি এখনো । এই স্পাইক প্রোটিনের একটা হিঞ্জ এরিয়া আছে আমাদের হাঁটু বা কনুই এর মত। প্রাকৃতিক ভাইরাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু ঝিল্লি প্রোটিন থাকে যে গুলো এই স্পাইক প্রোটিনকে স্থিতিশীলতা দেয়। কিন্তু mRNA ভ্যাক্সিনের মধ্যে এরকম কিছু অন্য প্রোটিন থাকেনা তাকে স্থিতিশীলতা দেবার জন্যে। এমনিতেই এই স্পাইক প্রোটিন এর গঠন ভঙ্গুর । তাই ফাইজার এবং মডারনা এই কোম্পানিকেই এই স্থিতিশীলতা দেবার জন্যে কিছু বাড়তি অ্যামিনো অ্যাসিড সংযোজন করতে হয়েছে।

এছাড়াও আরো বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে এই mRNA ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্যে। অ্যামিনো অ্যাসিড কোড সনাক্ত করা হয় ত্রিমাত্রিক ভাবে – AAU, AUA, UUA, UUU, ACG ইত্যাদি । ডঃ হরগোবিন্দ খোরানাকে মনে আছে ? তিনিই এর আবিষ্কার এবং এরজন্যেই তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কিন্তু এই ত্রিমাত্রায় চারটি বেস দিয়ে সৃষ্টি হয় ৪*৪*৪ = ৬৪ টি কোডের । কিন্তু যেহেতু প্রকৃতিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা মোট কুড়ি এবং সেই সাথে থাকে একটি প্রোটিন ট্রান্সলেশন থামানোর জন্যে কোড তাই প্রতিটি আমিনো অ্যাসিডের একাধিক কোড থাকে । নির্দিষ্ট কোন কোন বেসের কারণে এই mRNA এর প্রোটিন ট্রানস্লেশন ক্ষমতা কম বা বেশী হতে পারে। এবার এই ত্রিমাত্রার ভিতরে বেস ম্যানিউভার করে এই ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব মূল অ্যামিনো অ্যাসিডকে অপরিবর্তিত রেখেই। এই পরিবর্তন করা হয় সিলেক্টিভলি কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডের উপরে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের উপরে নয়। এছাড়াও mRNA কণার দুই প্রান্তে আনট্রান্সলেটেড অঞ্চল থাকে যাকে জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে UTR । এখানেও কিছু পরিবর্তন করে ভ্যাক্সিনের ট্রান্সলেট করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এইভাবেই আমরা পেয়েছি এই কোভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী mRNA ভ্যাক্সিন যাকে মনে করা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার হিসাবে ... স্টারটিং পয়েন্ট বা ডিজাইন স্টেজ থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট অবধি সে এসেছে রেকর্ড গতিতে ... কিন্তু রূপকথার মত আকাশ থেকে সে পড়েনি । তার পিছনে ছিল বহু বছরের নিরলস দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ।

এবং সেই সাথে আরো কিছু প্রতিশ্রুতি ...

এই লিপিড ন্যানো পারটিকেল কোটিনের মধ্যে দিয়ে mRNA ভ্যাক্সিনের প্রয়োগ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত হয়ত খুলে দিতে চলেছে যেটা না বললে সমসাময়িক বিজ্ঞানের গবেষণার প্রতি অবিচার করা হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা মস্ত বড়ো সমস্যা হচ্ছে যখন একটি ওষুধ কারো শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছে হয় ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে অথবা মাসলে পুশ করে ... অথবা ওরাল ড্রাগ হিসাবে তখন সেই ওষুধ বা ভ্যাক্সিন যাতে টার্গেট অথবা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে পারা । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই টার্গেট প্রোটিন হিসাবে কোড করে দেওয়া হয় একসাথে অনেক রকম কোষের – হার্ট , কিডনি , লাংস , স্টম্যাক , লিভার , হাড় , স্কিন ইত্যাদি। এখন কীভাবে আমরা নিশ্চিত হবো যে একটা হার্টের ওষুধ কিডনিতে না পৌছে সঠিক ভাবে হার্টের কোষেই পৌঁছাবে ? আশার কথা হল যে এই মুহূর্তে প্রচুর গবেষণা পত্র লেখা হচ্ছে যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লিপিড ন্যানো পারটিকেল কীভাবে এই নির্দিষ্ট কোষকে লক্ষ্য করে থেরাপিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফার্মাকোলজিতে অনেক নতুন দিগন্ত এনে দিতে চলেছে এই নতুন আবিষ্কার ।

করোনা অতিমারীর ভবিষ্যৎ

এই লেখাটি আমি যখন লিখছি তখন করোনা নিয়ে লেখা মানেই সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যকৌতুক ছাড়া অন্য কিছু মনে হবে বলে মনে হয়না। এবং পাঠক বিশ্বাস করুন! যদি আপনাদের এই হাসি আগামী আরো একবছর অথবা আরো বহুদিন অমলিন থেকে যায় তাহলে হয়ত আমার থেকে বেশী খুশি কেউ হবেনা।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে করোনার বিধি নিষেধ বেশ শিথিল এবং মানুষ জন বেশ ভালো ভাবেই মনে করছেন যে করোনা থেকে এই মুহূর্তে আর অতিমারির কোন আশঙ্কা নেই। তবু এরই মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন – আচ্ছা আবার কোন নতুন ঢেউ আসতে পারে ? সত্যি কথা বলতে করোনা অতিমারী হিসাবে শেষ হয়ে গেছে কিনা অথবা আবার সে ফিরে আসতে পারে কিনা এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর এক্ষুনি কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয়না।

তবে যে প্রশ্নটির উত্তর আমরা এই মুহূর্তে খুঁজতে পারি সেটা হল যে এই ভ্যাকসিন নিয়ে এত বিতর্ক হল যখন তখন সে এসে আমাদের কী কিছু উপকার হল সেই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা। আর সেই সূত্রে এই অতিমারীর চলে যাবার অথবা থেকে যাবার কী কী সম্ভাবনা রয়েছে বিজ্ঞানীদের মতে।

প্রথমেই শুরু করি ভ্যাকসিন আসার সঙ্গে এই ভাইরাসের গতিপ্রকৃতির সম্পর্ক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সেই আলোচনা।

The Devil is in the details

জীববিজ্ঞানী অভিজিৎ চক্রবর্তী ভাইরাস নিয়ে আলোচনার শুরুতেই এই চমৎকার ইংরাজী শব্দবন্ধের কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে অভিজিৎ বলছেন ধরুন আপনার কাছে একটা খবর এলো ভ্যাকসিন নিয়েও মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হচ্ছেন । অথবা আরো স্পষ্ট করে ইঙ্গিতবাহী খবর এলো যে হাসপাতালে ভরতি হওয়া কোভিড আক্রান্তের মধ্যে ৪০% ই ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন । অভিজিৎ বলছেন যে চাইলেই একজন শুধু এই খবরটুকুই তুলে ধরে প্রতিষ্ঠা করে ফেলতে পারেন যে ভ্যাকসিন আসলে কোন কাজ করছেনা। এবং যতক্ষণ না আপনি তথ্যের গভীরে যাবেন এই বক্তব্য বিশ্বাস না করার কোন কারণ খুঁজে পাবেন না।

খুব সুন্দর করে অভিজিৎ বিষয়টা ব্যখ্যা করেছেন । ধরুন কোন এক শহরে ১ কোটি লোক বাস করেন এবং তাদের মধ্যে ৯০% মানুষ ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নিয়েছেন । সাধারণ ভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ২% মানুষের। তাহলে এই ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৮০০০০ ভ্যাকসিন নেওয়া মানুষের করোনা উপসর্গ দেখে দিতে পারে। যদি ধরে নিই ভ্যাকসিন কাজ করবে ৮০% মানুষের শরীরে তাহলে এই ১৮০০০০ ভ্যাকসিন নেওয়া মানুষের মধ্যে কোভিড আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে ৩৬০০০ মানুষের। আবার এই ৩৬০০০ মানুষের মধ্যে ১০% মানুষের উপসর্গ সিভিয়ার হয়ে যেতে পারে কিন্তু যেহেতু ভ্যাকসিনের একটা নিজস্ব প্রভাব কাজ করবে এবং ধরে নিই যে ৭০% ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন সিভিয়ার উপসর্গ অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তি হবার সম্ভাবনা আটকাতে সক্ষম হবে কিন্তু ৩০% ক্ষেত্রে আটকাতে পারবেনা । এবং সেই কারণে এই ভ্যাকসিন নেওয়া মানুষদের মধ্যে থেকে মোট ১০৮০ জন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হবেন কোভিড নিয়ে ।

এবার বাকি ১০ লক্ষ লোক যারা ভ্যাকসিন নিলেন না তাঁদের মধ্যেও ২% মানুষের কোভিড হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ২০০০০ জন ভ্যাকসিন না নেওয়া মানুষ আক্রান্ত হবেন এবং তাদের মধ্যেও ১০% লোকের সিভিয়ার উপসর্গ বা হাসপাতালে ভর্তি হবার মত অবস্থা হতে পারে । অর্থাৎ ২০০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হবেন যারা ভ্যাকসিন নিলেন না।

শেষপর্যন্ত দেখা গেল এই হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি হলেন মোট ৩০৮০ জন মানুষ যাদের মধ্যে ১০৮০ জনই ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন অর্থাৎ ৩৩% এর বেশী হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ভ্যাকসিন নিয়েছেন। অভিজিৎ বলছেন আপনি যদি ঠিক করেন যে আপনি হবেন Devil's Advocate তাহলে শুধু এই তথ্যটুকুই তুলে ধরবেন আর মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এই বার্তা যে ভ্যাকসিন কোন কাজ করছেনা মানুষের শরীরে।

অভিজিৎ এর এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা কিন্তু এটাও উপলব্ধি করতে পারি যে স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে যেমন শয়তান থাকেন ঠিক তেমনি ঈশ্বর ও অবস্থান করেন । কারণ এই একই শহরে যদি এক কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০% লোকের দুটি ডোজ নেওয়া হত আর ৯০% লোক থেকে যেত ভ্যাকসিন সুরক্ষার বাইরে তাহলে এই একই অংকের হিসাব আমাদের যেখানে পৌঁছে দিত দেখা যেত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লোকেদের মধ্যে ভ্যাকসিন নেওয়া মানুষ প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই ভ্যাকসিন নিয়ে কোন তথ্য যখন আপনার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে তখন ভালো ভাবে বুঝে নিন যিনি এই খবর দিচ্ছেন তিনি শয়তান না ঈশ্বর কার অ্যাডভোকেট।

বেশ এবার এই অংকের জটিল হিসাব ছেড়ে বের হয়ে একবার ভারতবর্ষের বুকে করোনা ভাইরাস নিয়ে তথ্যের সরকারী হিসাবের দিকে তাকানো যাক । নীচের ছবিটি দেখুন এখানে একই সঙ্গে ভারতবর্ষে গত দু'বছরে নতুন সংক্রমণের সংখ্যা , মৃত্যুর সংখ্যা এবং ভ্যাকসিন নেওয়ার হিসাব দেওয়া হয়েছে । খেয়াল করে দেখুন প্রথম ওয়েভ

যখন এসেছে তখন ভ্যাকসিন আসেনি আমাদের কাছে । সংক্রামিত মানুষের মধ্যে মৃত্যু হার ছিল ৯২৩২৩ এর মধ্যে ১১৬৪ জন অর্থাৎ ১.২৬ % । এবার দ্বিতীয় ওয়েভের সময়ে যখন ভ্যাকসিন এসেছে কিন্তু মাত্র ৪ কোটি লোক ভ্যাকসিনের ডাবল ডোজ পেয়েছেন তখন সংক্রামিত ৩৯১০০৮ জনের মধ্যে মারা গেছেন ৪১৮৮ জন অর্থাৎ ১.০৭% । এরপরে তৃতীয় ওয়েভের সময়ে চলে আসুন ... সংক্রামিত ৩১১৯৮২ জনের মধ্যে মারা গেছেন ১০৪৩ জন অর্থাৎ ০.৩৩% ।

এই পরিস্কার হিসাব থেকে আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আপনিই ঠিক করুন বিজ্ঞান কিন্তু কোন শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পারেনা কোনদিনই । তাই সংখ্যাতত্বের মধ্যে থেকে এক্ষুনি কোন সিদ্ধান্তে না গিয়ে সে তাকিয়ে আছে ভাইরাসটির দিকে আর বুঝে চলেছে অনাগত কালখন্ডে কী হতে চলেছে যে সময় এখনো আসেনি আমাদের কাছে।

"The two most powerful warriors are patience and time"

লিও টলস্টয়ের এই বিখ্যাত উক্তিটি মাথায় রেখেই আমরা এবার এই করোনা ভাইরাসের শক্তির পরিচয় নেবার চেষ্টা করি আসুন । কথাটা বললাম এই কারণে যে ধৈর্য এবং সময় ছাড়া কোন লড়াই জেতা যায়না ... এবং বিজ্ঞানের ও তাই সবথেকে বেশী প্রয়োজন এই দুটোই এই নোভেল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে।

সেই জন্যেই শুধুমাত্র নীচের এই ছবিটি থেকে কিছু তথ্য পরিসংখ্যানের উপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এত নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেনা যে এই যুদ্ধে আমরা জিতে গেছি ইতিমধ্যেই । এমন কী জয়ের কাছাকাছি এসে গেছি এমন কথা বলার সময় ও মনে হয় এখনো আসেনি। তবে আপাতত যা পরিস্থিতি সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু যে বিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তে এত বেশী সন্দিহান তার প্রধান কারণ হল বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে যে কোন প্রাণী নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায় এবং সে কতদূর বা কতসময় ধরে টিকে থাকবে সেটা নির্ভর করে সেই প্রজাতির DNA 'র ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের উপরে । এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ভাইরাস যদিও জড় এবং জীবের মধ্যেকার একটা অবস্থা কিন্তু তারও এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপ আছে যেটা থাকলে কী হতে পারে সেটা বোঝার আগে আসুন আমরা একটু বুঝে নিই এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপ কাকে বলে ।

অভিজিৎ চক্রবর্তীর মতে এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের সাথে সবথেকে সুন্দরভাবে তুলনা করা যেতে পারে ক্লাসের একজন ছাত্র অথবা ছাত্রীর সাথে। ধরুন একজন ছাত্র বা ছাত্রী কতটা ভালো রেজাল্ট করেছে সেটা বোঝার নির্ণায়ক হল সে মোটামুটি সমস্ত সাবজেক্টে কেমন করেছে তার উপরে । কেউ হয়ত অংকে খুব ভালো কিন্তু ইংরাজীতে বেশ খারাপ আবার বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটি । কিন্তু আমরা সফল ছাত্র বা ছাত্রী বলি তাকেই যে প্রতিটা বিষয়েই ভালো করেছে ... অথবা অন্তত একটা বা দুটো ছাড়া অন্যান্য সব কটা বিষয়েই ভালো করেছে । এবার এই ভালো রেজাল্ট করার জন্যে প্রধান প্রধান যে ফ্যাকটর আছে সেগুলো ধরুন –১) মনে রাখার ক্ষমতা ২) পড়াশুনার জন্যে কতটা সময় সে দিতে পারছে বা দিচ্ছে ৩) তার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য। এবার কেউ থাকতে পারে যার মধ্যে এই তিনটি ফ্যাকটর একেবারে ‘০’ ... তাহলে তার পক্ষে আদৌ ভালো রেজাল্ট করা সমভব নয় । আবার কেউ কেউ থাকতে পারে যার মধ্যে এই তিনটি ফ্যাকটরই ১০০ মধ্যে ১০০ । তাহলে তার পক্ষে যে কোন পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করা অনায়াসে সম্ভব। কিন্তু এই দুই অন্তিম অবস্থায় থাকা বেশ বিরল । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের মাঝামাঝি যে অজস্র অসংখ্য কম্বিনেশন হবার সম্ভাবনা থাকে তার কোন একটা পজিশনেই থাকে প্রাণীর এক একটা ভ্যারিয়ান্ট। এবং এই ফ্যাক্টর গুলিকে একসাথে গ্রাফে রাখলে যে ত্রিমাত্রিক একটি স্থান হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপ।

মানুষ বা অন্যান্য প্রানীর ক্ষেত্রে এই ফিটনেসের প্রভাব একটু জটিল । কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপই নির্ধারণ করে সে কতদূর কতসময় ধরে বংশবিস্তার করে যাবে। করোনা ভাইরাসের একটি ভ্যারিয়ান্ট ডেল্টা যদি এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের একপ্রান্তে থাকে তাহলে ওন্য একটি প্রান্তে থাকে ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট। এবং এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে আরো অজস্র অসংখ্য অবস্থান বিন্দুতে করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ভ্যারিয়ান্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। এবং সে কেমন ভ্যারিয়ান্ট তৈরি করবে সেই ভ্যারিয়ান্ট এখনকার ভ্যারিয়ান্টের থেকে শক্তিশালী অথবা দুর্বল হবে কিনা অথবা সে মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না নিরীহ হবে সেটা নির্ভর করছে এই ভাইরাসের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রোটিন আছে তার উপরে ...১) তার মধ্যে হোস্টের শরীরে প্রবেশ করার স্পাইক প্রোটিন কেমন আছে ২) হোস্টের শরীরে প্রবেশ করার আগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এনভেলাপ প্রোটিন কেমন আছে ৩) অন্য প্রানী বা হোস্টের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিক্রম করার মত মেসেঞ্জার প্রোটিন কেমন আছে এবং ৪) নিজের মত করে আরো ভাইরাস রেপ্লিকেট করার মত প্রোটিন কেমন আছে এইসব বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উদান

করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের উপরে তাই বিজ্ঞানীরা নজর রেখে চলেছেন প্রতিনিয়ত যাতে নতুন কোন ভ্যারিয়ান্ট এলেই অথবা সম্ভাবনা দেখা দিলেই আমাদের সতর্ক করতে পারেন। এই অনুসন্ধানের পক্ষে একটা অসুবিধার জায়গা হল এত অসম্ভব দ্রুততার সাথে এই করোনা ভাইরাস বংশ বিস্তার করে যে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় একটা নতুন ভ্যারিয়ান্ট আসার অনেক পরে সেটা টের পাচ্ছেন । অনেক সময় অনেক নতুন ভ্যারিয়ান্ট এত দুর্বল যে সাথে সাথেই তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের জন্যে কোন সুযোগ না দিয়েই।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের কোন শেষ সিদ্ধান্তে আসতে নেই । আমরা যখন ধরে নিচ্ছি যে করোনার সঙ্গে এই যুদ্ধ আমরা জিতেই গিয়েছি তখনো বিজ্ঞানীরা সেই জয়মাল্য গলায় তুলে নিতে রাজি নন । তারা এখনো চোখ রেখে চলেছেন সভ্যতার এই অভূতপূর্ব সংকট বয়ে নিয়ে আসা ভাইরাসের দিকে ... তার ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপ অথবা রণসজ্জার দিকে ।

শৃগালের শেষপ্রহর ?

যে কোন অতিমারীর ক্ষেত্রেই যে পর্যায় গুলি একে একে আসে তাহল – প্রাদুর্ভাব (Outbreak) , মহামারী (Epidemic) , অতিমারি (Pandemic) এবং অন্তিম পরিণতি (Endemic) ।

এখন এই Endemic শব্দটির অর্থ কিন্তু একেবারে চলে যাওয়া নয় যেমন চলে গেছে স্মল পক্স । শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ endēmos থেকে যার অর্থ হল ‘ In Population ‘ অর্থাৎ জনগনের মধ্যেই থেকে যাওয়া। তবে এই থেকে যাওয়া আর তেমন ভয়ের নয় কারণ এই অবস্থায় ভাইরাসের চরিত্র ভীষণভাবে প্রেডিক্টেবল। যেমন সাধারণ সর্দি , কাশি , ইনফ্লুয়েঞ্জা থাকে আমাদের সাথে।

এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হল যে আমরা কী এখনই বলতে পারি যে এই এন্ডেমিক স্টেজে এসে গিয়েছি। বিজ্ঞানীরা বলছেন এখনো সেই সময় হয়ত আসেনি । তাদের এই বাড়তি সতর্কতার একটা কারণ যদি হয় ভাইরাসটির ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপ যার সম্পূর্ণ অ্যাসেসমেন্ট করা যায়নি এখনো । আর একটি কারণ হল পৃথিবীর সমস্ত দেশে ভ্যাকসিন এবং অসুখে আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে হার্ড ইমিউনিটি একসঙ্গে আসা সম্ভব নয় এবং যদি

কোনভাবে ভাইরাসের এমন কোন ভ্যারিয়ান্ট এসে যায় যে ভ্যারিয়ান্ট ভ্যাকসিনের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে এবং মানুষের সাধারণ অনাক্রমনতা বা হার্ড ইমিউনিটির বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে তাহলে কিন্তু ঈশান কোণে একটুকরো কালো মেঘের আশঙ্কা রয়েই গেল।

কিন্তু আমরা যেমন এই আশংকা থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারছিনা । তেমনি করোনা ভাইরাসের জন্যেও এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে এখন বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে। এই আলোচনা একদম শেষে করব । তার আগে বলি এই মুহূর্তে আমরা যে চতুর্থ ওয়েভের কথা বলছি সে ঠিক কী অবস্থায় আছে।

কিছুদিন আগেই আমরা হঠাৎ শুনলাম যে কানপুর আই আই টি’র একদল গবেষক নাকি একটি গাণিতিক মডেলে দেখিয়েছেন যে জুন মাস নাগাদ ভারতে এই চতুর্থ ঢেউ আসতে চলেছে Omicron BA.2 ভ্যারিয়ান্টের মাধ্যমে যার ঢেউ ইতিমধ্যেই এসেছে চীন , হংকং , আমেরিকা প্রভৃতি দেশে । তাদের মতে ভারতে এই নতুন ঢেউএর চূড়ান্ত অবস্থা আসবে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে এবং জুন থেকে শুরু করে প্রায় চার মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি চলবে এই ঢেউয়ের প্রভাব। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী এই একই গবেষক দল প্রায় নির্ভুল ভাবেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিল ভারতে তৃতীয় ঢেউ আসার বিষয়ে । তবে এই মুহূর্তে আশার কথা হল বিজ্ঞানীদের মতে চীন , হংকং অথবা আমেরিকার মত দেশে এই সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ যতটা নতুন ভ্যারিয়ান্ট তার থেকেও বেশী হল এই সমস্ত জায়গায় করোনার বিধি নিষেধ শিথিল হয়ে পড়া।

ভারতবর্ষে এই চতুর্থ ঢেউ আসা এবং এবং এলেও তার মারাত্মক হয়ে ওঠা বেশ অসম্ভব । তার একটা প্রধান কারণ হল ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ নিয়েছেন এবং সেই সাথে একটা বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই একবার বা দুবার করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছেন । অর্থাৎ একটা বিরাট অংশের জনগণ শরীরে অনাক্রমণতার অথবা প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে রয়েছেন। এই অবস্থায় একটা ভাইরাসকে যদি ঢেউ হয়ে উঠতে হয় তাহলে ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপে তাকে এমন একটা ভ্যারিয়ান্ট হবার রাস্তা পেতে হবে যে ভ্যারিয়ান্ট এই বিশাল সংখ্যক মানুষের স্বাভাবিক (বা প্রাকৃতিক) এবং ভ্যাকসিন থেকে প্রাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে ফেলতে হবে । যেটা হওয়া হয়ত বেশ কঠিন এই মুহূর্তে এই ভাইরাসের পক্ষে।

কিন্তু কঠিন হলেও , এক শতাংশ হলেও , এখনো সম্ভাবনা রয়ে গেছে এই ভাইরাসের সেই শক্তিশালী বংশধর খুঁজে পাবার তাই করোনার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে এখনো বিজয় উৎসব করার সময় আসেনি এইটুকুই বলা যেতে পারে।

এই মুহূর্তে SARS CoV-2 নামে এক ভাইরাস প্রজাতি তাকিয়ে আছে তার ফিটনেস ল্যান্ডস্কেপের দিকে এক সুযোগ্য , শক্তিশালী পৃথিবীকে কাঁদাবে এমন এক বংশধরের অপেক্ষায়। আর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে Homo Sapiens নামে এই বিশ্বের এক বুদ্ধিমান প্রজাতি।

দুজনের এই যুদ্ধে আপাতত অ্যাডভান্টেজ হোমোস্যাপিয়েন...... (শেষ)

তথ্যসূত্র ১) https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/05/covid-19-from-pandemic-to-endemic-this-is-how-we-might-get-back-to-normal
তথ্যসূত্র ২) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60832236
তথ্যসূত্র ৩) https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4915

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way--in short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only."

মুলুক - শান্তিনিকেতন

গতমাসে আত্মজা'র বেশ কিছু সদস্য ঘুরে এলেন মুলুক – শান্তিনিকেতন … তারই কিছু মুহূর্ত ধরা পড়ল সদস্যদের লেন্সে।

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি – চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;
ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ”

“ যখন পথের পাশে পেয়ে গেছি একটি বৃক্ষকে
যখন বৃক্ষের পাশে পেয়ে গেছি পাতার কুটির
যখন কুটির পার্শ্বে পেয়ে গেছি রাঙা নদীখানি
যখন নদীর পাশে পেয়ে গেছি একফালি ভুঁই
ভুঁই থেকে উঠে আমি যখন হয়েছি ভুঁইফোঁড়
তখন তো বৃক্ষে উঠে হবোই হাওয়ায় কাঁপা ডাল ”

Howrah District Adoption Meet Nov 24

Atmaja Workshop March 2024

আত্মজার কার্যকরী সমিতি ২০২৩ – ২০২৫

অনুপ দেওয়ানজী – চেয়ার পার্সন
অঞ্জন বসু চৌধুরী – ভাইস চেয়ার পার্সন
সঞ্জয় শিকদার – সম্পাদক
শঙ্কর নস্কর – সহকারী সম্পাদক
প্রসুন গাঙ্গুলী – কোষাধ্যক্ষ

" কার্যকরী সদস্য বৃন্দ"

সুবীর ব্যনার্জি
নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত
অচিন বসু
দীপঙ্কর পাত্র
সংঘমিত্রা পাল
সীমন্তিকা নাগ
কৌস্তভ ভট্টাচার্য
পি কে চট্টোপাধ্যায়

আত্মজা পরিবারের সমস্ত সদস্যদের প্রতি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা
আত্মকথা'র সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে… স্বপন নস্কর

যোগাযোগ– 9903036928 / 9432321716 / 9051672992

ই মেল – atmaja_calcutta@yahoo.com ওয়েবসাইট – www.atmaja.org.in

Regd.No. S/1L/1184 of 2000-01 under W.B.Societies Act 1961